বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল

●

শ্রীমতিলাল রায়

প্রথম প্রকাশ: ১৯২৩, ৭ই জুলাই

দাম: এক টাকা

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হ
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী. বি. এ. কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং
এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২/৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম। আত্মরক্ষার্থে ও পরের রক্ষার্থে যুদ্ধ না করা অধর্ম্ম। আমরা বাঙালী জাতি শত শত বর্ষ সেই অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি। * * সাহসের জন্য আর একটু চাই। এই চাই যে, জাতীয় সুখের অভিলাষ যখন প্রবলতর হইবে—এত প্রবলতর হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন শ্রেয়োবোধ হইবে—তখন সাহস হইবে। * * বাঙালীর এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখনও ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ই ঘটিতে পারে।"

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(প্রাক্ অগ্নিবিপ্লব-যুগের ভবিষ্যদ্বাণী)

"The murder of Narendranath Gossain which was committed by persons actually in custody in one of His Majesty's prisons is unique in the history of Bengal."

Bengal Administration Report 1908-9

বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল

বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্বে লাঠি-খেলায় ভাবী বিপ্লবী কানাইলাল

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র দের সৌজন্যে)

প্রাক্-কথন

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল লিখিত 'কানাইলাল' প্রবন্ধ প্রবর্ত্তক পত্রিকার ৭ম বর্ষের (১৯২২ সাল) ৫ম সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। তৎপরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার দিন দুইয়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের মুখেই বইখানি তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। সে-সময়ে 'কানাইলাল' দেশের মধ্যে বিপুল উত্তেজনা সৃষ্টি করে। কানাইলাল-জীবনের এমন নিখুঁত প্রামাণ্য চিত্র আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। বস্তুতঃ কানাইলাল সম্পর্কিত সব রচনাই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ-ভাবে প্রবর্ত্তকে প্রকাশিত এই রচনার নিকট ঋণী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আজও পর্য্যন্ত 'কানাইলাল' পুস্তকের চাহিদা আছে এবং থাকিবেও এইজন্য যে, কানাইলাল এ-জাতির স্মৃতি হইতে কোনদিন নিঃশেষে মুছিয়া যাইতে পারে না। মৃত্যুই কানাইলালকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়াছে। তাই এই অসাধারণ জীবন-কাহিনীর সূচনা শ্মশানে আর শেষ আঁতুর ঘরে। ইতি—

প্রকাশক।

॥ কেওড়াতলা শ্মশানে অন্তিম শয়নে শহীদ কানাইলাল ॥

জন্ম ঃ ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৫ (জন্মাষ্টমী) মৃত্যু ঃ ২৫-এ কার্ত্তিক, ১৩১৫।

জন্ম নয়, জীবন নয়, মহামরণই কানাইলালকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়াছে।

ভারতের মুক্তি-যজ্ঞে
হে বিপ্লবী শহীদ কানাই,
যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেছ
প্রাণবীর্য্যে আত্মাহুতি দিয়া,
সে পুণ্য অমর স্মৃতি
জন্মক্ষেত্রে থাক উদ্ভাসিয়া
অনন্তকালের বুকে—
হে যাজ্ঞিক, তব মৃত্যু নাই।

(কবি বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত রচিত উপরের কাব্যার্ঘ্য চন্দননগর ষ্ট্রাণ্ডে স্থাপিত কানাইলালের আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তির নীচে খোদিত আছে)।

॥ শ্মশানে কানাইলাল ॥

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ, ৯ই নভেম্বর, সোমবার। সন্ধ্যার পর কয়েকজন বন্ধুর সহিত কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপর একখানি বাসাবাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। আগামী কাল কানাইলালের ফাঁসি। তার মৃতদেহ সংকারের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। কানাইলাল মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়াছিল, শ্মশানযাত্রাটা যেন একটু জাঁকজমকে সম্পন্ন করা হয়—ব্যক্তিগত গৌরবের জন্য নয়, উমিচাঁদ, মীর্জ্জাফরের জাতি যে এই প্রথম মৃত্যুশেল বুকে ধরিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল জাতির জীবনে এই স্মৃতি জাগাইয়া রাখাই বোধ হয় তার উদ্দেশ্য ছিল।

সে রাত্রি কি উৎকণ্ঠায় গিয়াছে। আজিকার রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই কানাইলালের জীবনলীলা সাঙ্গ হইবে, অথচ ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না; বরং উল্টাই মনে হইতে লাগিল, জেলের ফটকে গিয়া শুনিব কোন এক অভূতপূর্ব্ব উপায়ে কানাইয়ের জীবন রক্ষা হইয়াছে: আশার চাতুরী স্বপ্নের সৃষ্টি করে, সান্ত্বনা দেয় না। মর্ম্ম তাই ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, শিরায় শিরায় ঢেউ দিয়া রক্ত ছুটিতেছিল, গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাসে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিতেছিল. সে রাত্রে আর চক্ষে ঘুম আসিল না।

কানাইলাল হত্যাকারী। এই তার অপরাধ। নরেন্দ্রনাথও কি অপরাধী নয়? কানাই হত্যা করিয়াছে নরেন্দ্রনাথকে, তাই তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ দেশের গলায় ছুরি দিতে উদ্যত হইয়াছিল—নরেন্দ্রনাথ যে দেশবৈরী। দেশবৈরীর কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই?

রাজশক্তি বৈদেশিক, দেশ পরাধীন, সুতরাং নিরুপায় জাতিকে অন্যায়কারীর আঘাত সহিয়াই যাইতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম করিতে, সে যুগে যে একদল লোক মাথা তুলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, কানাইলাল

তাহাদেরই একজন ; সেই-ই প্রথমে জাতির এই পঙ্গুতা, অক্ষমতা টুটাইয়া দেশ-শত্রুকে অপসৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে বিপ্লববাদীদের সকল প্রচেষ্টাই প্রায় নিষ্ফল হইয়াছিল। অতীতের এই সকল ব্যর্থতা তার প্রাণে বড় আঘাত দিত, তাই সাফল্যের দিকেই সে ঝোঁক দিয়াছিল। দেশী রিভলভারের শেষ কার্টিজটি পর্য্যন্ত কানাই আততায়ীর বক্ষভেদে ব্যবহার করিয়াছিল, পাছে নরেন্দ্রনাথ না মরে এইজন্য কার্টিজগুলি একে-একে শেষ করিয়াই তবে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল। মরণ বরণ করিয়াই দেশ-শত্রুনিধনে সে সিদ্ধকর্ম্মী—দেশের কণ্ঠে তুমুল জয়ধ্বনি সেদিন তাই আকাশে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল।

চিন্তায় চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। অতি প্রত্যুষে শৌচাদি সারিয়া, মৃতদেহ সৎকারের জন্য যে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা গুছাইয়া লওয়া হইল। জানি না এই শোচনীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই উৎসাহে হৃদয় যেন দুলিয়া উঠিতেছিল, গণ্ডীবদ্ধ জীবনের পাষাণ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বিপ্লবসেনা সেদিন যেন আমায় ঘিরিয়া ধরিতেছিল, শ্বাসে শ্বাসে আগুনের হল্কা ছুটিতেছিল।

পথে বাহির হইয়াই আবার এক নূতন ঘটনা। অবধারিত মৃত্যুপথের যাত্রী, সহসা জীবনের পথে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, মৃত্যুর রজ্জুবদ্ধ অসার জীবনে চেতনার স্পন্দন অনুভূত হইল, ধস্তাধস্তিতে এ যেন রক্তের হোরি খেলা! হকারের বুকে বড় বড় অক্ষরে গোয়েন্দা পুলিশ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিধনবার্ত্তা দেখিতে পাইলাম—কাল রাত্রে কে তাহাকে রিভলভারের গুলীতে নিহত করিয়াছে। বুঝিলাম, কানাইলালের অগ্নিনালিকার ভীমগর্জ্জনে দেশের বিপ্লবপন্থীরা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘটনার দুই একদিন পূর্ব্বে, Overtoon Hall-এ ছোটলাট সার এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার সাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। কিন্তু রিভলভারের গুলী না-ছোটায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। শত শত বৎসরের পুঞ্জীভূত অশুদ্ধতার

পাহাড় কে যেন মশাল জ্বালিয়া আগুন ধরাইয়া দিল. বাংলার বিপ্লব যুগ তাহারই পরিচয়।

প্রতিকার-পরাঙ্মুখ বাঙালী চরিত্রে এইরূপ নির্ম্মম প্রতিহিংসার আগুন লুকাইয়া থাকিতে পারে, ইহা কাহারও জানা ছিল না, এই অভিনব চরিত্র বিকাশে, সারা দেশে যেন বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। আমার মনে আছে, নরেন্দ্রনাথের হত্যা সংবাদ দেশবাসীর মনে পৌঁছিবামাত্র, হর্ষে বিস্ময়ে তাহারা এমন অভিভূত হইয়াছিল যে, কেহ কেহ উলঙ্গ হইয়া কাপড মাথায় বাঁধিয়া প্রকাশ্যে নৃত্য করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই। শুনা যায়, আজিকার সুরেন্দ্রনাথ সেদিন Bengalee অফিসে বসিয়া সন্দেশ বিতরণ করিয়াছিলেন—আমাদের তরুণ প্রাণে উত্তেজনার ঢেউ যে তুফান তুলিবে. তাহাতে আর বিচিত্র কি?

একপ্রকার মাথা গরম করিয়াই জেলের ফটকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কানাইলালের অগ্রজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের দেখিয়া জেল-কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন, আমরা কানাইলালের মৃতদেহ লইতে প্রস্তুত হইয়াছি। কিছুক্ষণ পরে, মাত্র পাঁচ ছয়জনের প্রবেশ অধিকারের হুকুম লইয়া একজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী আমাদের মধ্যে কে কে যাইতে চাহেন জিজ্ঞাসা করিল। আশুবাবু, আমি ও কানাইলালের অপর তিনজন আত্মীয়সহ আমরা কম্পিত চরণে সেই ব্যক্তির অনুসরণ করিলাম—শোকে-দুঃখে তখন সর্ব্বাঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

ধীরে ধীরে লৌহ কপাট উন্মুক্ত হইল, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। যন্ত্রপুত্তলিকার মতই শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর অনুসরণ করিতেছি, সহসা সেই ব্যক্তি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া একটি কামরা দেখাইয়া দিল ; সেই অনতি-প্রশস্ত কক্ষের একপার্শ্বে, কালো কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকা, কানাইলালের মৃতদেহ পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। আমরা কয়জনে বুকে জাপ্টাইয়া, জেলের বহিঃপ্রাঙ্গণে আনিয়া শবদেহ মাটির উপর নামাইয়া রাখিলাম—কেহই

আবরণ উন্মোচন করিতে ভরসা করিল না, আশুবাবুর গণ্ড বাহিয়া মুক্তার মত অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, একে একে সকলেই কাঁদিতে লাগিলাম; এমন সময় সেই শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী বলিল, "কাঁদিতেছেন কেন? এরূপ বীর যুবক যে দেশে জন্মিয়াছে সে দেশ ধন্য, জন্মিলে তো মরিতেই হয়, এমন মরা ক'জন মরিতে পারে?" আমরা বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সেই বিদেশীর চক্ষেও অশ্রু ঝরিতেছে। সে আবার বলিল, "আমি একজন কারারক্ষী, কানাইলালের সহিত আমার অনেক কথা হইত, মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ হওয়ার পর তাহার প্রফুল্লতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর তাহার মুখে এমন মিষ্টি হাসি দেখিয়াছি, তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। আমি বরং বলিয়াছিলাম, কানাই, আজও হাসিতেছ, কাল কিন্তু মৃত্যুর ছায়ায় তোমার প্রফুল্ল ঠোঁট দু'খানি কালো হইয়া যাইবে; দুর্ভাগ্যবশতঃ কানাইয়ের মৃত্যুকালেও আমায় তাহার নিকট উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। কানাইয়ের চক্ষে আবরণ, সে যখন ধাপের পর ধাপ উঠিয়া রজ্জুতে কণ্ঠ-সংলগ্ন করিতে উদ্যত, ঠিক এমনই সময়ে ফিরিয়া আমার সাড়া লইল, তারপর তেমনই হাসিতে হাসিতে কহিল, 'মিষ্টার, আমায় তুমি কেমন দেখিতেছ?'—এমন বীরত্ব রক্তমাংসের মানুষে সম্ভব হয় না।"

আমরা হতভম্ব হইয়া কথা শুনিতেছি, এমন সময় কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব প্রমুখ কয়েকজন উচ্চ কর্ম্মচারী আসিয়া মৃতদেহ বাহিরে লইয়া যাইবার তাগিদ দিলেন। কঠোর ভবিতব্য। অতি সন্তর্পণে কম্বলখানি অপসারিত করা মাত্র কি দেখিলাম, সে তপস্বী কানাইয়ের দিব্য রূপের পরিচয় দিবার ভাষা নাই—দীর্ঘকেশ প্রশস্ত ললাটে ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র যেন এখনও অমৃত আস্বাদে ঢুলু ঢুলু, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপুটে সঙ্কল্পের জাগ্রত রেখা ফুটিয়া উঠিতেছে, আজানুলম্বিত বাহুযুগল মুষ্টিবদ্ধ। আশ্চর্য্য! মৃত্যুযন্ত্রণার একটি কুঞ্চিত বীভৎস চিহ্নও

কানাইয়ের কোন অঙ্গে আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না, কেবল উভয় স্কন্ধ রজ্জুর পীড়নে নমিত হইয়া পড়িয়াছে, মৃত্যুর ছায়া সে পবিত্র মুখশ্রী একটুও বিকৃত করিতে পারে নাই। অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে জেলের পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া লালপেড়ে ধুতিখানি পরাইয়া দেওয়া হইল, গলায় কোঁচান উড়ানি সমানভাবে উভয়দিকে ঝুলাইয়া কানাইলালকে সজ্জিত খাটের উপর শয়ন করান হইল, ললাটে চন্দন, বিছানার চতুষ্পার্শ্বে ফুলের মালা—কে বলিবে এ মৃতদেহ! সে এক নূতন বেশে কানাইলাল যেন মৃদু মধুর হাস্য করিতে লাগিল। কয়জনে মিলিয়া খাটখানি উঠাইয়া ধরিলাম, হ্যালিডে সাহেব আসিয়া ধমক দিলেন, কানাইয়ের মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত হয় নাই বলিয়া; আমি তাঁর আদেশ মান্য করিতে প্রস্তুত নহি এইরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে আশুবাবু বৃথা গোলযোগ না করিয়া সাহেবের কথামত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন, কাজেই একখানি নূতন বস্ত্রে কানাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, আমরা জেলের বাহিরে আনিতে প্রস্তুত হইলাম। জেলপ্রহরী আমাদের যে পথ দেখাইয়া দিল, তাহা অতি অপ্রশস্ত, একদিকে সারি সারি পায়খানা, অন্যদিকে আদিগঙ্গার খাল; সরু পুলের উপর দিয়া অতি কষ্টে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, সম্মুখে সমুদ্র তরঙ্গের মত নরমুণ্ড দৃষ্টিপথ আকর্ষণ করিল। সাগর গর্জ্জনের মত "বন্দেমাতরম্" শব্দে আমাদের কর্ণপটহ ছিন্ন হইবার উপক্রম করিল—দেখিতে দেখিতে আমরা জনসমুদ্রে ডুবিয়া গেলাম। তাহার পর যে কি হইল কিছুই বুঝা গেল না। সে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কেমন করিয়া কানাইলালকে লুফিতে লুফিতে শ্মশানের পথে ছুটিল, কোথায় শবগাত্র আবরণের বস্ত্র উড়িয়া গেল, লক্ষ লক্ষ ফুলের মালা কোথা হইতে ছুটাছুটি করিয়া অজস্র বর্ষণ আরম্ভ হইল, কিছুরই নিরাকরণ রহিল না। শুধু বাঙ্গালী নয়, ভারতের সকল প্রদেশ হইতে এত লোক যে কানাইলালের শ্মশানযাত্রায় যোগ দিতে উপস্থিত হইবে, এ ধারণাই

আমাদের ছিল না। কানাইলালের শেষ সাধ পূর্ণ করিতে স্বয়ং বিধাতা যেন ছড়াছড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমরা নির্ব্বাক নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল সে অভাবনীয় দৃশ্য চক্ষু ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম।

শ্মশানে শব রক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দল সারি দিয়া পথ করিয়া দিল, অসংখ্য নরনারী সেই পথ ধরিয়া কানাইলালের চরণধূলি মস্তকে ধরিতে লাগিল, অসংখ্য গীতা কানাইলালের শয্যার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ফুল চন্দন বিল্বপত্রের সহিত গীতাও অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইতেছিল। কানাইয়ের শবদেহ তখন যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ।

দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে জনসমুদ্র কিঞ্চিৎ স্থির হইল, তখন কয়েক-জন ভদ্রলোক আসিয়া আশুবাবুকে কানাইলালের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলেন, আমাকেই সে অনুরোধ পালন করিতে হইল। একখানি টুলের উপর দাঁড়াইয়া, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, সত্যই এ নরমুণ্ডের সমুদ্র, পুরুষ-নারী আজ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়াছে। কথা শেষ হইলে, ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ স্তূপীকৃত হইতে লাগিল, কে যে এই সকল করিতেছে তাহা আমরা জানিলাম না। ধূ ধূ করিয়া চিতানল জ্বলিয়া উঠিল, কলসী কলসী ঘৃত বর্ষণ আরম্ভ হইল—অগ্নিশিখা আকাশ চুম্বন করিল। সারাদিন কেবল ঘৃত আর চন্দনকাষ্ঠ চিতানলে অবিরত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আগুন আর নিভে না, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম, কে কাহার কথা শুনে, লক্ষ লোকের সংগৃহীত সুগন্ধি দ্রব্য, কাষ্ঠ, ঘৃত চিতায় আহুতি চলিতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের আর বিলম্ব নাই, দেখিলাম এইবার সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া উত্তেজনার পর বিমর্ষ চিত্তে চিতাপার্শ্বে উপবেশন করিল—সুবিধা বুঝিয়া চিতা নির্ব্বাণের জন্য এক কলসী জল চিতায় নিক্ষেপ করিলাম; অমনি শত শত সহস্র সহস্র কলসী জল চিতায় ঢালা হইতে লাগিল। চিতা নির্ব্বাণের পর অস্থি আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, একমুষ্টি ভস্ম গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইল।" তারপর চূর্ণ

অস্থির অন্বেষণ ও ভস্মের জন্য কাড়াকাড়ি, কাহারও সোনার কৌটা, কাহারও রৌপ্যের, কাহারও গজদন্তের ; এমন হাজার হাজার নরনারী একটুকরা অস্থি, একমুঠা ভস্মের সংগ্রহে উন্মাদ হইয়া উঠিল—আমরা একখণ্ড অস্থি রৌপ্য কৌটায় লইয়া বাটী ফিরিলাম।

ফিরিলাম যখন, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইবে। বোধ হয় সেদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনী. হাস্নুহেনার গন্ধে বাড়ীখানি ভরিয়া উঠিয়াছিল, সভয়ে উঠানে দাঁড়াইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলাম, "বন্দেমাতরম্"—হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল বুকে সেদিন বজ্রের মতই বাজিল। কানাইয়ের বিধবা জননী আলুথালু বেশে কানাইকে ফিরিয়া চাহিলেন, আমরা নতজানু হইয়া, বীর-পুত্রপ্রসবিনী বিধবার চরণরেণু মাথায় লইয়া, আর একবার করুণ স্বরে উচ্চারণ করিলাম—"বন্দেমাতরম্"।

সে আজ চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা, স্মৃতির সূত্র ধরিয়া অতীতের অনেক কথাই আজ জাগিয়া উঠিতে চায়, কানাইলালের অসম্পূর্ণ জীবন-কাহিনীর কয়েকটা কথা উহারই একটি তরঙ্গ মাত্র।

কানাইলাল আমার বয়োকনিষ্ঠ ছিল। ছোট ভাইয়ের মতই তাহাকে স্নেহ করিতাম, কিন্তু শ্মশানের পরিচয়ই তার সঙ্গে আমার সত্য পরিচয়, মরণের মধ্য দিয়াই সে আমায় তার জলন্ত অমর স্পর্শটি দিয়া গিয়াছে, তাই তার জীবন আলোচনা করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্মশানের কথাই আসিয়া পড়িল, আর জীবনচিহ্ন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখান হইতেই আমি তার সত্য পরিচয় পাইতে আরম্ভ করিয়াছি।

॥ ফাঁসীর প্রতীক্ষায় ॥

কানাইলালের একুশ বৎসর পরমায়ুটুকুর মধ্যে কেবল এই একটি ঘটনাই তার জীবনকে জগদ্বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের জন্য জগতে গুপ্তহত্যার সংখ্যা বিরল নহে; কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাসে প্রচণ্ড প্রতাপশালী ইংরাজের সুরক্ষিত কারাগারে অস্ত্রসংগ্রহ করিয়া আততায়ীর রক্তদর্শন এক অভাবনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে হয়; তাছাড়া, পরবর্ত্তী যুগে বাংলায় যে বিপ্লব-হুতাশন আরও প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল, তাহার কারণই হইতেছে, কানাইয়ের আত্মদান। বিপ্লব-সাধনের সিদ্ধমন্ত্র যেন তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে কুণ্ডলী পাকাইয়া সারা বাংলার আকাশে-বাতাসে ছাইয়া পড়িল, তাহা না হইলে বিপ্লব-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত বারীন্দ্রকুমার ধৃত হইয়া ইহার আমূল ইতিহাস রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের সমক্ষে স্বীকার করিয়া পরিশেষে, যখন বলিলেন, "I persuade them all to give written statement to Ram Sadai Mukerjee, because I believe that as this plan was found out it was destined not to do any other work in connection with National freedom." তখন বাস্তবিকই নব জাগ্রত তরুণ বাঙ্গালীর মনে অবসাদ ও নৈরাশ্যের বড় করুণ ছায়াপাত হইয়াছিল, মরণের ডাক দিয়া এ যেন ফিরাইয়া দেওয়ার মতই গভীর ক্ষুণ্ণতায় তাহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর কানাইলালের হস্তে অপ্রত্যাশিতভাবে যেদিন অগ্নিনালিকা গর্জ্জিয়া উঠিল, যেদিন সর্ব্বজনবাঞ্ছিত নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু ইংরাজ কারাগারের লৌহপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া সত্য মূর্ত্তিতে দেখা দিল, সেদিন বাঙ্গালী আবার নূতন আশায়, নূতন উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ইহার ফলস্বরূপ ১৯০৮ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী যে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রত্যেক রেখাটি মর্ম্মছেঁড়া রুধিরসিক্ত তুলিকায় আঁকা, বিস্মৃতির মসীলেপে উহা আর লুপ্ত হইবার নহে।

স্বদেশী, বাঙ্গালীর জাগ্রত জীবনের পরিচয় যুগ। ইহার পূর্ব্ব হইতেই বাংলায় জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল; লর্ড কর্জ্জনের জীবননাশের কল্পনা স্বদেশী যুগের পূর্ব্বেই একবার ফলপ্রসূ করার প্রচেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তখনও স্বপ্নকে সার্থক করার মত বীর্য্য ও সাহস বাঙ্গালীর জন্মায় নাই, তাই কেবল স্বপ্নের সোনালী খেলা লইয়াই একদল লোক আত্মপ্রসাদ লাভে মগ্ন ছিলেন। বারীন্দ্রনাথ প্রথমে এই ভাবের খেলাকে, আগুনের রঙে আঁকিয়া তুলিতে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পাশ্চাত্যের বিপ্লব-নীতি, প্রাচ্যের রাষ্ট্রসাধনার পক্ষে কতখানি উপযোগী, সে কথা এ ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয় নহে। তবে এই রক্তলীলার সূত্র ধরিয়াই যে বাঙ্গালী যথার্থ জাগরণের আস্বাদ পাইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এইজন্যই নবযুগের পুরোহিত রূপে বারীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর পূজনীয়, বাংলার নূতন ইতিহাস রচনার তিনিই অগ্রণী বীরনায়ক।

নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া আছি, এই চেতনা জাগার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক রাজশক্তির শাসন বড় বেদনার, বড অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণ, অনৈতিক অত্যাচার বলিয়া অনুভূত হইল: প্রথম রাজশক্তির করুণা উদ্রেকের চেষ্টায় আবেদন-নিবেদন প্রভৃতির অনুষ্ঠান, তারপর প্রতিবাদ, চরম প্রতিবাদ বঙ্গভঙ্গ নীতির বিরুদ্ধে, তাহাও যখন ব্যর্থ হইল, বারীন্দ্র প্রমুখ কয়জন সাহসী যুবক তখন গোপনে শাসনযন্ত্র বিকল করিয়া দিবার উদ্যোগে মনোযোগ দিলেন।

মানুষের বড় ভয় জীবনের। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ক্ষেত্রে মানুষ স্বেচ্ছায় মরণের আহ্বানে যোদ্ধবেশে উপস্থিত হয়, জানিয়া শুনিয়াই সেখানে মরণ লইয়া খেলা; কিন্তু অতর্কিতে, অপ্রস্তুত অবস্থায়, গুপ্তঘাতকের আঘাতে প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন-আশঙ্কা লইয়া, সুস্থমনে রাজ্যশাসন বড়ই বিঘ্নজনক। সে যুগের এই নবরাষ্ট্রসাধকগণ সর্ব্বপ্রথমেই রাজশক্তির মনে এইরূপ আতঙ্ক সৃষ্টির আয়োজন করিলেন। ছোটলাট স্যার এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজারের পুনঃ পুনঃ প্রাণ-

নাশের চেষ্টা, কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা, চন্দন-নগরের মেয়র তার্দ্দিভেল সাহেবের শয়নকক্ষে বিস্ফোরক ছুঁড়িয়া দেওয়া, এই সকল ইহারই নিদর্শন। সে যুগে ব্যাপকভাবে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া ইংরাজ তাড়াইবার উদ্দেশ্য অপেক্ষা, রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের মনে ঘোরতর আতঙ্ক সঞ্চার করিয়া শাসন সংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তনের দিকেই যেন অধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছিল। তবে এরূপভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ছিল না; পূর্ণ অরাজকতার যুগে বিপ্লব ঘোষণা সহজ হইয়া উঠে; এ নীতিও অগ্নিহোত্রীদের মাথায় যে না ছিল এরূপ নহে। তাঁহাদের স্বীকারোক্তির মধ্যেই ইহার সঙ্কেত পাওয়া যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, বারীন্দ্রকুমারের একটি চেষ্টাও সাফল্যলাভ করে নাই, ভুলক্রমে নিরপরাধিনী মিসেস ও মিস কেনেডিযুগলের শোচনীয় মৃত্যু না ঘটিলে, তাঁর এত বড় বিপ্লবানুষ্ঠানে নরহত্যাজনিত রক্তপাতে কারও হস্ত রঞ্জিত হইত না। কিন্তু তবুও এইসব ব্যর্থ ঘটনার লোমহর্ষণ কাহিনী, সংবাদপত্রের স্তম্ভে বড় বড় হরফে যখন প্রকাশ পাইত, দেশের বুকে উৎসাহ ধরিত না; অনেক তরুণ মরণের উল্লাসে মাতিয়া উঠিত, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মরা প্রাণে জীবনের জোয়ার আনার খেলায় বারীন্দ্রকুমার যেন সিদ্ধহস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহু শত বৎসরের জড়তা অপনোদন করিয়া বারীন্দ্রকুমারের এই ভীষণ নরমেধ যজ্ঞ দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের আরম্ভেই সাফল্যলাভ বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু কানাইলাল এই ব্যর্থতার কারণ অন্বেষণের জন্য অত্যন্ত চিন্তাশীলতার সহিত আলোচনা করিত। তার জীবনে ভাবের বন্যা বহিতে বড় দেখি নাই, মুখে তার কথা ছিল না, সর্ব্বদাই স্থির, একনিষ্ঠ সাধকের মত, সকল কর্ম্মই চূড়ান্ত না করিয়া সে ছাড়িয়া দিত না; এই বিষয় লইয়া সে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, তাহা আমরা তার মুখেই শুনিয়াছি। কানাইলাল বলিয়াছিল, টেরোরিষ্টদের (terrorist) একটি বড় দোষ যে,

তাহারা লক্ষ্য সাধনের অপেক্ষা আত্মরক্ষার দিকেই অধিক ঝোঁক দিয়া চলে। শুধু ব্যর্থতা নয় এই ত্রুটি রাখিয়া চলিলে, ভবিষ্যতে ইহারা মারাত্মক ভুল করিয়া বসিবে। মিঃ কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের হত্যাসাধন করিতে গিয়া দুইজন নিরপরাধিনী শ্বেতাঙ্গ মহিলা যেদিন মারা পড়িল, সেদিন বুঝিলাম কানাই-লালের অনুমান মিথ্যা নহে। এই সিদ্ধান্ত তাহার জীবনে কিরূপ দৃঢ় শিকড় গাড়িয়াছিল, তাহা নরেন্দ্রনাথের হত্যাকালেই আমরা দেখিতে পাই। লক্ষ্যসাধনে এমন নিষ্ঠার পরিচয়, এমন মরিয়া হইয়া উঠা, ইহার পূর্ব্বে বড় দেখা যায় নাই। ভবিষ্যতে বিপ্লবপন্থীদের মধ্যে যে একাগ্রতা ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছি, তাহা যে কানাইয়ের দান এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

কানাইলালের সংসার তাদৃশ সচ্ছল ছিল না; তাই এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া তাহাকে একবারই ই. আই. রেলের এজেন্ট অফিসে দেড় মাসের জন্য চাকুরী করিতে হইয়াছিল। এই অবস্থাতেও তার প্রফুল্লতার অভাব দেখি নাই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে খুল্লতাতের সাহায্যে কানাই বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময় দেশপ্রীতির অনাবিল স্রোতে তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, পড়াশুনায় সে আদৌ মনোযোগ দিতে পারিত না। সহতীর্থগণের মধ্যে কি একটা নূতনের স্পর্শ জাগাইবার জন্য সে আকুল হইয়া অনেক-কিছুর অনুষ্ঠান করে, সে কথা পরে বলিব।

বি. এ. পরীক্ষার পর কানাইলাল চৈত্র মাসের এক অপরিষ্কার অপরাহ্নে মায়ের কাছে চির বিদায় গ্রহণ করিতে দাঁড়াইল। কানাই যেন মহা-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশধর্ম্মে দীক্ষিত সত্যব্রত কানাই দেশজননীর চরণে আত্মবলি দিবার সঙ্কল্প করিয়া, আবার গর্ভধারিণী, ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত পারিবারিক বন্ধন কেমন করিয়া রাখা যায়, ইহার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইত না। তাই চন্দননগর হইতে কলিকাতায় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিবার কালে, তাহার মনে হইয়াছিল সে যেন এক নূতন জগতের

যাত্রী, পুরাতনের সহিত তাহার আর পরিচয় রাখা চলিবে না ; কর্ম্মোপলক্ষে ইহার পর দুই একবার তাহাকে চন্দননগরে আসিতে হইলেও শৈশব-স্মৃতি জড়িত, স্নেহপ্রীতির নিলয় মাতৃগৃহে সে আর প্রবেশ করে নাই। এমন একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ সাধক না হইলে সবখানি দিয়া কেহ কি মায়ের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে ?

কানাই চিরদিনই অল্পভাষী—মিথ্যা তাহার মুখে বাহির হয় নাই। তাই সে চির বিদায়ের দিনে, মাতৃপ্রদত্ত দুগ্ধ মুড়ি খাইয়া, প্রফুল্লমুখে মায়ের চরণে মাথা নত করিয়া যখন বলিল, আমি চাকুরী করিতে যাইতেছি, তখন মায়ের মনে অবিশ্বাসের কোন ছায়াই স্পর্শ করে নাই, এমন কি সেদিন পর্য্যন্ত তিনি সন্তানের কথায় বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন ; জানিনা কানাই কোন অমর ধর্ম্মের আস্বাদে সত্য-মিথ্যা এক করিয়া সেদিন জন্মগত অভ্যাসের বিপরীত আচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে সংবাদপত্রে দেখা গেল, ইংরাজরাজের উচ্ছেদ সাধন সঙ্কল্পে ব্রতধারী ত্রিশজন সন্তান রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছে, এই ত্রিশজনের মধ্যে আমাদের কানাইলালও আছে। কানাইয়ের জননী এ কথা শুনিয়া সামান্য বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ছেলে চাকুরী করিতে গিয়াছে, সে নিরপরাধ, তাহার মুক্তির জন্য ভাবনা নাই। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

তারপর প্রকাশ পাইল, নরেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছে। কানাই-জননী কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, এমন কি কেহ নাই এই নরাধমকে ইহজগৎ হইতে সরাইয়া দেয়,—কে জানিত, তাঁর এই বাণীর অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষের অব্যর্থ সঙ্কেত অপেক্ষা করিতেছিল, আর এই বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য করিয়া তুলিতে, তাঁরই নাড়ী-ছেঁড়া ধন কানাইলাল প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল।

৩১শে আগষ্ট কলিকাতায় গিয়া শুনিলাম, নরেন জেলে হত হইয়াছে।

আগুনের মত ঐ সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, কানাইলালের জননীর কর্ণেও এ সংবাদ পৌঁছিল, মর্ম্মভেদী শেলের মত পুত্রশোকের নিদারুণ বিভীষিকায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন, যুগপৎ গর্ব্বে, শোকে, দারুণ উৎকণ্ঠায় তিনি দিনপাত করিতে লাগিলেন।

বোমার মামলায় কানাইলাল তেমন কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, সে নিতান্ত ভালমানুষটির মত, যথারীতি আদালতে আসিয়া হাজির হইত এবং যথাকালে জেলে গিয়া বিশ্রাম করিত। এই ঘটনায় কানাইয়ের খোঁজ পড়িল, দেশ বিদেশে তার কীর্ত্তির কথা প্রচার হইয়া পড়িল। দেশীয় সংবাদপত্রে ভয়ে ভয়ে কানাইয়ের বীরত্বের কিছু কিছু প্রশংসা চলিতে লাগিল। ইংরাজী সংবাদপত্রসকল ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া কানাইয়ের কর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল; কেবল "পাইওনিয়র" কানাইলালের এই অদ্ভূত কীর্ত্তির সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তৎকালে "পাইওনিয়র"-এ যাহা বাহির হইয়াছিল তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিলাম: "নরেন্দ্রনাথ আত্মরক্ষার্থে, তাহার সমস্ত সহচরদিগের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেখানে দাঁড়াইবার অবসর পাইলে পাছে সে আরও ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়, সেইজন্য তৎপূর্ব্বে তাহারা উহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিল। এস্থলে একের নিপাতে বহু লোকের উদ্ধারসাধন। উহারা সহচরদিগের মঙ্গলার্থেই নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করিয়া অকুতোভয়ে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। যদিও ইহা হত্যা, কিন্তু কখনই হীন, কাপুরুষোচিত কর্ম্ম নহে। আত্মত্যাগের গৌরবালোকে ইহা সমুজ্জ্বল।" "পাইওনিয়র"-এর এই মন্তব্যে 'ইংলিশম্যান', 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' একেবারেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা যে "পাইওনিয়র"-এর সাময়িক মতিভ্রম, এবং অন্য কোন দেশীয় সংবাদপত্রে এরূপ হইলে উহা যে রাজবিদ্রোহমূলক হইত, এ কথা তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কানাইলালের এই বীরত্বপূর্ণ কর্ম্মে ইংরাজমহলেও যে

উত্তেজনার ঢেউ উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এখনও একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের সহানুভূতিসূচক কথা আমাদের স্মৃতিতে জাগরূক আছে। জেলের পশ্চাত দ্বার দিয়া সেই অনতিপ্রশস্ত পথ ধরিয়া যখন কানাইয়ের শবদেহ বহন করিতেছিলাম, বিশাল জনসমুদ্র যে কানাইকে সম্মান দেখাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, সাহেব সে কথা তখনও জানিতে পারে নাই, তাই তিনি আশুবাবুকে বার বার বলিতেছিলেন. কি দুঃখের বিষয়, এমন বীরের সম্মান দেখাইতে এ দেশ জানে না। আমাদের দেশে এমন বীরের যদি জন্ম হইত, এ যে বড় দুর্লভ জন্ম, জানিনা, কিরূপ সম্মান আমরা তাহাকে দেখাইতাম। এবং কানাইলালের শব বহনকালে বহু ইংরাজপুরুষ ও মহিলা কানাইয়ের মৃতদেহ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গৃহবারান্দায় কিরূপ ব্যগ্র ও সতৃষ্ণ নয়নে অপেক্ষা করিয়াছিল, সে দৃশ্য ভুলিতে পারিব না ; অনেক সহৃদয় ইংরাজ খানসামাকে দিয়া ঋতুপুষ্পের গুচ্ছ পাঠাইয়া কানাইয়ের সম্বর্দ্ধনা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

নরেন্দ্রনাথের হত্যার পর কানাইয়ের অগ্রজ মাত্র দুইবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর আশু-বাবু কানাইলালের সহিত যখন প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তখন কানাইলাল প্রফুল্লবদনে অগ্রজকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ফাঁসির দিন কি স্থির হইয়াছে—যেন সে জীবনের কাজ শেষ করিয়া পরপারের প্রতীক্ষা করিতেছে, মুখে চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই। এমন মুক্ত সচ্ছন্দ অবস্থা দেখিয়া আশুবাবুর মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না। দু'জন য়ুরোপীয় ওয়ার্ডার আশুবাবুকে বলিল, "He is a wonderful chap, he is always bright." এ কথা সকলেই শুনিয়াছেন যে, চিররুগ্ন কানাইলাল মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাওয়ার পর নূতন স্বাস্থ্য নূতন সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইয়া-ছিল, স্বর্গীয় লাবণ্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিল্লোল্লিত হইয়া উঠিয়াছিল, আশুবাবু

তাহার হাতখানি একবার স্পর্শ করিবার লোভসম্বরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আদেশ না থাকায় ওয়ার্ডারযুগল প্রথমে ইহাতে আপত্তি করে, পরে তাহারা বলে, 'বাবু, আমরা অন্যদিকে মুখ ফিরাইতেছি, এই অবসরে আপনি করমর্দ্দন করুন।' সে স্পর্শ ভুলিবার নয়, সে অনুভূতির আস্বাদ অব্যক্ত, ভাষায় তাহা কলঙ্কিত হয় মাত্র।

ফাঁসিদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কানাইকে আশুবাবু আপীল করিতে অনুরোধ করেন, সঙ্গে উকিলও ওকালতনামা লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কানাইয়ের দৃঢ়তা ভঙ্গ হইবার নয়, সে অবিচলিত চিত্তে ইহাতে আপত্তি করে। উকিল কানাইলালের উচ্চ অবস্থা ও পরমভাব দেখিয়া, নিজেই সে কথা প্রত্যাহার করেন। কানাই যে তখন মৃত্যুঞ্জয়ী শিব, প্রতি মুহূর্ত্তে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলার আহ্বান প্রতীক্ষায় কোন রক্তমাংসের মানুষ কি এমন আনন্দ ও শান্তিতে দিনের পর দিন রুদ্ধ কারায় নবীন স্বাস্থ্যে জীবন ভরাইয়া তুলিতে পারে? সে সময়ে কানাইলালের সঙ্গে ছিল একখানি গীতা আর একখানি বিবেকানন্দের কর্ম্মযোগ। কানাইয়ের শ্মশান-শয্যা গীতায় ছাইয়া গিয়াছিল, সে কথা বলা হইয়াছে। বাংলার ঘরে এমন সত্যব্রতী বীরকর্ম্মী দুর্লভ। আমরা কানাইয়ের সহিত তাহার অগ্রজের একটি দর্শন বিবরণ দিয়াই এই করুণ পরিচ্ছেদ শেষ করিতে চাই।

আশুবাবু বলেন, "কানাইয়ের দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। জেল-কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট আবেদন করাতে তাহারা আমাকে জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট আমাকে যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। আমি আমার মাতার পক্ষ হইয়া নিরালায় কানাইয়ের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করিতে, তিনি বলিলেন যে, অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমি দেখা করাইয়া দিতে পারি না। তিনি আমাকে জেলের দরজার নিকট অপেক্ষা

করিতে বলিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পর, জেলরক্ষক আমার নাম লিখিয়া লইল, এবং খুব সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। আমার সহিত দুইজন জেলার এবং দুইজন প্রহরী ছিল। সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একধারে প্রহরী বেষ্টিত গারদ। আমাদের জন্য তাহার দরজা খোলা হইল এবং আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, আমাদের দক্ষিণের প্রথম কক্ষেই কানাই পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় পদচারণ করিতেছে। তাহার চশমা না থাকার দরুণ সে আমাদের চিনিতে পারে নাই, তথাপি নির্ভীক দৃষ্টিতে আমাদের প্রতি চাহিয়া দেখিল। সে আমার সহিত বেশ হাসিয়া কথা কহিল। আমি তাহার এইরূপ আচরণে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার সমস্ত কথা আমি ভুলিয়া গেলাম। সে এরূপ উৎসাহের সহিত তাহার ফাঁসির কথা জিজ্ঞাসা করিল, যেন তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া সে চলিয়া যাইতে ব্যগ্র। সে মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল, এবং বলিল, যেরূপভাবে জেলে পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে এখানে মাকে আনিবার আবশ্যক নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনুমতি দিলে, সে তার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত। তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর দেখিলাম না। আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ও মার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।"

কানাইয়ের জীবন বলিতে এইরূপ কয়েকটি করুণ মর্ম্মস্পর্শী মুহূর্ত্ত ভিন্ন তো আর কিছুই নয়, সবখানিই যেন ব্যথার শিহরণ, কথার ছন্দে এই বেদনার সুরই গাহিতে বসিয়াছি।

॥ কারাগারে ॥

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে বিপ্লববাদীদের জয়ডঙ্কা প্রথম বাজিয়া উঠে। অব্যর্থ লক্ষ্যসাধনের ইহা জয়বাদ্য না হইলেও,

অস্ত্রহীন জাতির শক্তিশেল আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হওয়ায় নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দেশের প্রাণে সেদিন উৎসাহ রাখিবার আর স্থান থাকে নাই। এই সময় হইতেই সেই যে উপর্য্যুপরি উত্তেজনার একটানা স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, হিমালয়ের মত বাধার পর বাধা সৃষ্টি হইলেও, তাহা আর রুদ্ধ হয় নাই। বরং ফল্গু-প্রবাহের মত বাঙ্গালীর প্রাণে গভীর হইতে গভীরতর স্তরে খাদ কাটিয়া ইহা ছুটিয়াছে। কোন্‌দিন প্রবল উচ্ছ্বাসে বাঁধ ভাঙ্গিয়া আগ্নেয়গিরির মত অনল উদ্গীরণ করিয়া সে স্রোত আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা কে জানে?

মজঃফরপুরের এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডে যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল প্রফুল্লকুমার ওরফে দীনেশচন্দ্রের আত্মহত্যা সংবাদে। এই প্রফুল্লকুমার ও ক্ষুদিরাম কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে হত্যা করিবার জন্য কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। ক্ষুদিরাম ওয়ানি ষ্টেশনে ধৃত হইয়াই সহকারী প্রফুল্লকুমারের নামোল্লেখ করে। এই স্বীকারোক্তির ফলে মোকামা ষ্টেশনে প্রফুল্লকুমারকে পুলিশকর্ম্মচারী নন্দলাল গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হয়; অনন্যোপায় প্রফুল্লকুমার রিভলভারের গুলীতে আত্মঘাতী হইয়া বিপ্লবপন্থীর চরম চরিত্রের একটা নিদর্শন রাখিয়া যায়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে গলাবাজির পরিবর্ত্তে উৎপাটিত হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তধারা দেশযজ্ঞে ঝরিতে দেখিয়া দেশসেবার ভঙ্গী সেদিন কোন্‌দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

শুধুই ইহা নহে, ব্যর্থতার ভিতর দিয়াই বিপ্লববাদের ঊনপঞ্চাশ বায়ু ঝড়ের মত নিঃসাড় বাঙ্গালীর প্রাণে প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করিল, মরণের রঙ্গে সারা দেশ মাতাল হইয়া উঠিল। ঘটনার পর ঘটনাই এইরূপ মত্ততার মূল ইন্ধন।

প্রফুল্লকুমার ও ক্ষুদিরাম প্রসঙ্গ পরিপাক করাই দেশের পক্ষে তখন দুঃসাধ্য ছিল; এমন প্রচণ্ড কর্ম্ম, ভেতো-বাঙ্গালীর হাড়ে যে কখনও সম্ভব হইতে পারে, এরূপ ধারণা করা যাইত না। তাহার উপর যুগপৎ কলিকাতার

বিপ্লবকেন্দ্র পুলিশ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়া পড়ায়, বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় আগুন ছুটিল। গাড়ী গাড়ী বোমা, কার্টিজ, রাইফেল প্রভৃতি বিপ্লবানুষ্ঠানের আসবাবপত্র যখন রাজপথের উপর দিয়া চালান হইতে লাগিল, তখন লাভ-ক্ষতির হিসাব জ্ঞান আর কাহারও রহিল না; স্বাধীনতার স্বপ্ন যে সার্থক হইতে পারে, এই নূতন আশায়, জীবন একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিল। ইহার উপর আবার বারীন্দ্রের বিদ্যুদ্বর্ষী স্বীকারোক্তি,—আরে বস্—চিররুগ্ন মুমূর্ষু, সেও সেদিন উদ্যত-ফণা গোক্ষুরার মত মাথা তুলিয়া রোগশয্যায় উঠিয়া বসিল, উৎসাহে আনন্দে দেশের কণ্ঠে যে জয়ধ্বনি উঠিল, তাহা আজও কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলিতেছে।

এইরূপ উত্তেজনা অকারণ ঘটে নাই। দেশ তখন মরিয়া হইয়াই অত্যাচারের প্রতিবিধান খুঁজিতেছিল। বারীন্দ্র প্রমুখ বিপ্লবপন্থীগণ প্রাণ দিয়া দেশের চাওয়া পূরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু এই মাতৃযজ্ঞ রাজ-শক্তির কুলচক্রে অকালে নিষ্পেষিত হওয়ায়, কর্ম্মীগণের মন অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িলেও দেশ ইহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা নিরাশ হয় নাই; ভবিষ্যতের আশায় বরং অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ধরা পড়িয়া বারীন্দ্রকুমার নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। দেশের অনেক আশার তিনি কেন্দ্র ছিলেন, কাজেই কি করিতে পারিলে তবুও অবধারিত রাজদণ্ড মাথায় তুলিয়া লইবার পূর্ব্বে জীবনকে কতকটা সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যায়, বন্দীদশায় এই চিন্তায় তাঁহার মত অনেকেই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশও বন্দীগণের মুখের দিকে তাকাইয়া আরও কিছু যেন প্রত্যাশা করিতেছিল; কিন্তু সেটা যে কি, তাহা উভয় পক্ষেই অজ্ঞাত রহস্যের মত স্বপ্নের পর স্বপ্নই সৃষ্টি করিতেছিল। অবশেষে, কানাইলাল যখন সেই রহস্যের দ্বার-উদ্ঘাটন করিয়া দেশের চাওয়াকে সগৌরবে মূর্ত্ত করিয়া ধরিল, ত্রিশ কোটি মানবদৃষ্টি তখন সবিস্ময়ে দেখিল—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সত্যসত্যই তাহারা কি চাহিতেছিল! প্রতিবিধিৎসার তুষানল শান্তিবারি

সেচনে যেন শীতল হইয়া গেল, পরিতৃপ্ত ভারতের কণ্ঠে কানাইয়ের স্তুতিগীতি মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। ভারতের জাতীয় মন্দির যদি কখন গগনচুম্বী চূড়া বিস্তার করিয়া আত্মমহিমা প্রচারে সমর্থ হয়, তবে সেদিন সে মন্দিরে ভারতবাসী কানাইয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে।

অন্তরে বাহিরে এই সকল উত্তেজনা কথঞ্চিৎ পরিপাক করিয়া বিপ্লবনেতৃগণ কারাগারে থাকিয়াই, এই অমোঘ সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হইলেন, সেই কথাটাই এইবার বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অসংখ্য দেশসেবক রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে থাকিলে, বারীন্দ্রকুমার বোমার সাহায্যে ইহার প্রতিবিধানে যত্নবান হন। তিনি এই উদ্দেশ্য লইয়া দেশনেতৃগণের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সকলেই সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টই বলেন, "There is the national vengeance you had better taken it up." বারীন্দ্রকুমার চতুর্দ্দিক হইতে উৎসাহ পাইয়া দেশের চাওয়া বলিয়াই ইহা গ্রহণ করেন। তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন, "We thought it was the voice of the nation and we have begun to make serious preparation."

কিন্তু এই জনমত রাজশক্তির কঠোর শাসনে ক্রমেই কিরূপ উল্টা সুর ধরিতে আরম্ভ করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বারীন্দ্রকুমারও পরাক্রান্ত রাজশক্তির হস্তে পতিত হইয়া এই সাধের স্বপ্ন সাময়িকভাবে ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহার আভাষ পূর্ব্ব প্রবন্ধে দিয়াছি। বিপ্লবসাধন সম্ভাবনায় হতাশ হইয়া দারুণ মনোভঙ্গের ফলেই খুব সম্ভব তিনি ধরা পড়িয়াই পুলিশের নিকট অনেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলেন। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা, বারীন্দ্রকুমার যদি আত্মকথা ব্যক্ত না করিতেন, নরেন্দ্রনাথের পক্ষে রাজসাক্ষী হওয়া হয়তো ঘটিয়া উঠিত না। তাঁহার চিত্রিত কঙ্কালের উপর রঙ ফলাইয়াই নরেন্দ্রনাথ দেশের ঘোরতর অনিষ্ট সাধনে সুযোগ পাইয়াছিল; কিন্তু আবার এ কথাও অস্বীকার করিলে চলিবে না

যে, বিপ্লবযজ্ঞের পুরোহিতের মুখে মুক্তিসাধনার এই অলৌকিক কাহিনী অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিল বলিয়াই স্বাধীনতা-প্রয়াসী তরুণদের জীবনে অমৃতের মত ইহা অপূর্ব্ব বলবিধানে ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিয়াছিল।

যাহা হউক, ধরা পড়ার প্রথম উত্তেজনা প্রশমিত হইলে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত বিপ্লবপন্থা ধরিয়াই দেশ যাহাতে মুক্তিপথে অগ্রসর হয়, জেলে বসিয়াই তাহার আয়োজন চলিতে থাকে। বাহিরে ইহাদের যে সব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের সহিত পত্র-ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়, বোমা প্রস্তুত-প্রণালী, দল গঠনের নব নীতি লিপিবদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইতে থাকে।

অবস্থা ক্রমে আরও পাকাপাকি হইয়া উঠিল। চিঠিপত্র আদানপ্রদান হইতে হইতে রিভলবার পর্য্যন্ত চালান চলিতে লাগিল। কানাইলাল এই সময় জেলের ভিতর থাকিয়া বিপ্লবনেতাদের সহিত ভাল করিয়া মিশিতে আরম্ভ করে।

জেলে তিনবার কানাইলালের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রথম সাক্ষাতে তাহার কথা শুনিয়া বুঝি, আইনের ফাঁক দিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ যে বাহির হইতে পারিবে, সে আশা তাহারা রাখে না। কানাইলালের বিরুদ্ধে তেমন বিশেষ অভিযোগ না থাকিলেও, সে সহতীর্থদের সহিত সমান দশা ভোগ করিতেই অধিক ব্যগ্র। এমন কি আশুবাবু কানাইলালকে জামিনে খালাস করিবার জন্য উকিল নিযুক্ত করিতে চাহিলে, সে ইহাতে ঘোরতর অসম্মতি প্রকাশ করে, এবং বলে "সঙ্গীদের অদৃষ্টের সহিত আমার অদৃষ্ট যখন জড়িত, তখন সকলের যাহা হইবে, আমিও তাহাই ভোগ করিব।" উকিল প্রায় এক ঘণ্টা কানাইলালের সহিত এই বিষয় লইয়া কথোপকথন করিয়া যখন বুঝিলেন যে, কানাইলালের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা বড় সহজ কথা নহে, তখন তিনি আশুবাবুকে এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কানাইলালকে প্রথম দেখিয়াই বুঝিলাম, সে যেন একটা কিছু মতলব ভাঁজিতেছে। কথা প্রসঙ্গে মাথা হেলাইয়া সে একবার খুব জোরে জোরে বলিয়া উঠিল, "...মনে করিও না জেলে পচিবার জন্য এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, আন্দামানে অথবা ফাঁসিকাষ্ঠে নিরীহ মেষের মত প্রাণ দিতে জন্মিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তো তেমন গুরুতর কিছুই নাই, সুতরাং মুক্তির আশা একেবারেই যে নাই, এমন ধারণা করিতেছ কেন?" তাহার উত্তরে কানাইলাল বলিয়াছিল, "আমার বন্ধুদের সহিত সমান দশা ভোগ করিতে না পারিলে, আমি নিজেকে অত্যন্ত হতভাগ্য বলিয়া মনে করিব।" এই অবস্থায় কানাইলালের কারাদণ্ড ভোগ করা ভিন্ন আর কি গতি হইতে পারে, তাহার কোন আভাষ না পাইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সেদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পর আরও দুইবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রথম বারের অপেক্ষা দ্বিতীয় বার তাহাকে অধিক উত্তেজিত দেখি। তৃতীয় বার সে একেবারেই মরিয়া, মুক্তির আনন্দে তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে যে মুক্তিলাভ করিল, সে মুক্তির কথা ঘূণাক্ষরেও তখন জানিতে পারি নাই। কানাইয়ের সহিত এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। সেটা প্রায় জুন মাসের মাঝামাঝি হইবে। এই সময় হইতেই নরেন্দ্রনাথের উপরে সকলের সংশয়দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার পর আর কানাইকে দেখি নাই, সেই আমার শেষ দর্শন। বঙ্কিম গ্রীবায় বীরেন্দ্র-কেশরী নির্ভীক কানাই কি একটা স্পর্দ্ধার কথা, বীরত্বের স্বপ্ন আমার স্মৃতিতে আঁকিয়া দিয়াছিল, আগুনের সোনালী রঙে সেটা আজও দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই রহিল, তার চেয়েও গৌরবের, বীরত্বের জয়ধ্বজা সে উড়াইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর কীর্ত্তিস্তম্ভ কানাই বাঙ্গালীকে সার্থক করিয়াছে।

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ হইলে বারীন্দ্রকুমার ভাবিয়াছিলেন সদলবলে জেল ভাঙ্গিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িবেন, বাহিরে মোটরের ব্যবস্থা থাকিবে, একেবারে মধ্যপ্রদেশে অথবা কোন পর্ব্বতমালায় দুর্গ স্থাপন করিয়া খণ্ডযুদ্ধে কোম্পানী বাহাদুরকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবেন। এই প্রস্তাব কতটা যুক্তিসঙ্গত, তাহা লইয়া নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে থাকে। দুই চারিজন ছাড়া অবশেষে সকলেই এই মরণরঙ্গে সাঁতার কাটিতে সম্মত হন। আয়োজনের ত্রুটি ঘটিল না, একটি একটি করিয়া, প্রহরীগণের চক্ষু এডাইয়া, অগ্নিনালিকা বন্দীগণের হস্তগত হইতে লাগিল; নরেন্দ্রনাথের হত্যার দিনই হয়তো সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু দুই একটা অস্ত্র হস্তগত হইলেই বারীন্দ্রকুমারকে গোপন করিয়া আবার এক স্বতন্ত্র দল গড়িয়া উঠিল এবং তাহারা গভীর ষডযন্ত্রে দেশবৈরী নরেন্দ্রনাথকে হত্যা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিল।

এই দলে পাঁচজন মাত্র লোক ছিলেন। সত্যেন, কানাই ও আরও তিন-জনে এই পরামর্শ স্থির করিয়া বারীন্দ্র যাহাতে ইহা জানিতে না পারে, তাহার জন্য বিশেষ সতর্ক হইলেন। কেননা প্রথম হইতেই মতের পর মত পরিবর্ত্তন করায় বারীন্দ্রকুমারের অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। এই ভীষণ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি যে বাধা দিবেন, এ বিষয়ে ইঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। প্রথম স্বীকারোক্তিতে বিপ্লব নিবারণ চেষ্টা, তারপর আবার বিপ্লবদল গঠনের যুক্তি, পরিশেষে নিজেরাই জেল হইতে বাহিরে গিয়া পূর্ব্বানুষ্ঠান সফল করার সঙ্কল্প, ইহার কোনটাই ইঁহাদের মনঃপূত হইতেছিল না। অথচ এই অবস্থায় ঠিক কি করিলে দেশের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করা যায়, তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছিলেন না। তারপর ২৫এ জুন প্রকাশ্য সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথ যখন বিপ্লবদলের আমূল সন্ধান ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল, তখন এই পঞ্চজন দেশভক্তের ঠোঁটে বিদ্যুতের রেখা দেখা দিল, ভ্রূকুঞ্চনে বজ্রকঠোর সঙ্কল্পে

ঢেউ খেলিতে লাগিল, দন্তাঘাতে ওষ্ঠ রক্তাভ হইয়া উঠিল, কটাক্ষের ইসারায় সত্যেন্দ্র ও কানাই আত্মদানে উদ্বুদ্ধ হইল। ইহার পর এই পঞ্চজনে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, সত্যেন্দ্র হাসপাতালে থাকিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিকটে আনিয়া মৃত্যুশেল হানিবেন, কানাই সত্যেন্দ্রের পৃষ্ঠরক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিবে।

কিন্তু সত্যেনের গুলী ব্যর্থ হইল। উঃ সে কি মনঃক্ষোভ! কত শত বৎসরের প্রতিহিংসা, ভারতের জাতীয় জীবন দহন করিতেছে বল দেখি? জয়চাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত গৃহশত্রুর কুটিল হাসির জ্বালাময়ী বহ্নিতে জাতির অস্থিমজ্জা যে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে! কানাই প্রমাদ গণিল, বালিশের তলা হইতে ভীমবজ্র নিষ্কাশিত করিয়া ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মত লম্ফ দিয়া শিকারের ঘাড়ে চাপিল। দুড়ুম, দুড়ুম, দুড়ুম! রক্তস্নাত হাস্যময় কানাইয়ের উন্নত ললাটে স্বদেশজননী স্বহস্তে জয়টীকা পরাইয়া দিলেন।

বিপ্লবযুগের এই দারুণ ব্যর্থতার মধ্যে চূড়ান্ত সার্থকতার জয়ধ্বজা উড়িল, ভারতের ভাগ্যবিধাতা হাসিমুখে ভবিষ্য ভারতের ইতিহাস সেইদিন হইতে আবার নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বিধাতার অব্যর্থ নির্দ্দেশ পালন করিয়াই অমর জাতির যে মুকুটমণি,—দেশ যাহা চাহিয়াছিল, আপনাকে বলি দিয়া কানাই তাহাই পূরণ করিয়াছে। ইহার জন্যই না কানাই আজ এমন মহিমামণ্ডিত!

॥ স্বদেশী যুগ ॥

প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে, কানাইলালের জীবনের শেষ দিকটাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এইবার সরলচিত্ত নিরীহ কানাই, স্বদেশগত প্রাণ পরোপকারী কানাই, রুধিরলিপ্ত দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ বিপ্লবপথে কেমন করিয়া আসিল, কেমন করিয়া তাহার কোমল করুণার্দ্র হৃদয়খানি ধীরে ধীরে বজ্রের মত কঠিন ও নির্ম্মম হইয়া উঠিল, সেই কথারই আলোচনা করিব।

এই বিপ্লব-সাধনা ব্যষ্টিভাবে শুধু কানাইকেই অধিকার করে নাই, একটা সমষ্টি শক্তি ইহার ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রাণ দিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল; কানাইলাল এইরূপ বিপ্লব-সমিতির মূর্ত্ত প্রতীক। তাই কানাইলালের গোড়ার কথা বলিতে হইলে স্বভাবতঃ অনেক কথাই আসিয়া পড়ে, এবং সেইগুলি না বলিলে, কানাইলালের সবখানি বলা হয় না। সে যুগে প্রতি স্বদেশভক্তের অন্তরের উদ্দীপনা, তরুণ বাংলার আভ্যন্তরীন অবস্থারই পরিচয় দেয় অতএব কানাইলালকে বুঝাইবার জন্য আমাদের কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তবে ইহা স্বদেশী যুগের সবখানি ইতিহাস নহে, নানা ঘটনার আবর্ত্তনে, অসহায় তরুণ বাঙ্গালী কেমন করিয়া ধীরে ধীরে নিরুপদ্রব স্বদেশী সাধনার ক্ষেত্র হইতে রক্তনদীতে সাঁতার দিতে নামিয়াছিল, তাহারই একটি চিত্র মাত্র।

আমি স্বদেশী যুগের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কানাই-লালের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। কানাইলালের বাল্যজীবন প্রবাসে প্রবাসেই কাটিয়াছিল, প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় সে চন্দননগরে আসিয়া স্থানীয় ডুপ্লে কলেজে ভর্ত্তি হয়। এই সময় স্বদেশপ্রীতির প্লাবনে বাংলার মাটি আজিকার মত এতখানি সরস হইয়া উঠে নাই; বিপ্লবের ঝড়ে আঘাতের পর আঘাতে তরুণ প্রাণ তখনও উদাস হইয়া ছুটে নাই; স্বাধীনতার বাণী, কণ্ঠস্থ কবিতার অস্পষ্ট উচ্চারণেই পর্য্যবসিত; নৈতিক জীবনের ভিত্তি এতই আল্গা যে, দেশের কোন সদনুষ্ঠানে একত্র মিলিত হওয়াই তখন অসাধ্য ছিল—অবসাদ চারিদিকেই যেন ঘিরিয়া ধরিয়াছে। আশার গান স্বামীজির কণ্ঠে নিঃসৃত হইয়া কোথাও কোথাও ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে—ইহাই ছিল তখন উর্দ্ধমুখী জীবনগতির একমাত্র অবলম্বন। এই উজান টানে গা-ভাসান যাঁহারা দিতে পারিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে তাঁহারাই দেশসাধনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। এইরূপ একটি শক্ত নৈতিক জীবনের উপর ভর করিয়াই বাংলার স্বদেশী

দাঁড়াইবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু তাহা যতখানি চরিত্রবল থাকিলে সম্ভব হইত, ততখানি চরিত্রবল না থাকায় বাংলার স্বদেশী পরিপূর্ণ সার্থকতা পায় নাই। বিধাতার দান এমনই করিয়া সেদিন বাঙ্গালী ব্যর্থ করিয়াছে।

সৌভাগ্যবশে, উর্দ্ধমুখী আকর্ষণের অভূতপূর্ব্ব স্পর্শ আমাদের জীবনেও অনুভূত হইয়াছিল; কি একটা নূতনের সুরে জীবন যেন দিন দিন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, সকল কাজই সুন্দর ও শুদ্ধভাবে নিষ্পন্ন করিবার প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই আমাদের যেন পাগল করিয়া তুলিত। পাড়ায় পাড়ায় হরি-সঙ্কীর্ত্তন, অসহায় প্রতিবাসীর সাহায্য, অতিথি সেবা, মৃতদেহ সৎকার প্রভৃতি সৎকর্ম্মে উৎসাহের অবধি থাকিত না; এই সকল কর্ম্মে কানাইলালের প্রত্যক্ষ সহায়তা না পাইলেও তাহার আন্তরিক সহানুভূতি নানাভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িত। অনেক ক্ষেত্রে শুধু কানাই নয়, অনেক যুবকই পারিবারিক শাসনে ইচ্ছা থাকিলেও সকল কার্য্যে যোগদান করিতে পারিত না।

আমাদের একটি মিলন-কেন্দ্র ছিল। অবসরকালে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের জন্য একটি অবৈতনিক নাট্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যাকালে কানাইকে এইখানেই বিশেষভাবে দেখিতে পাইতাম। কোনদিন সে এস্‌রাজের তারে ছড়ি টানিয়া আমোদ অনুভব করিতেছে, কোনদিন বা হারমোনিয়ামের পর্দ্দা টিপিয়া আকাশপানে মুখ তুলিয়া বিকৃতকণ্ঠে গলা ভাঁজিতেছে। হারমোনিয়ামের সুর আর তাহার গলার আওয়াজ একেবারে ভিন্নমুখে দৌড়াইলেও, সেদিকে তাহার হুঁশ থাকিত না; সব কাজের মত এই তার স্বভাববিরুদ্ধ নাট্যকলায় কখনও অভি-নিবেশের অভাব ঘটিতে দেখি নাই। আমাদের রিহার্সাল দিবার সময় হইলে তাহাকে নিরস্ত করিবার সঙ্কেতটা প্রায় তাহার নাকের ডগায় গিয়া পৌঁছাইত, তখন সে সহসা ঘুমভাঙ্গা মানুষের মত চমকিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া বসিত। তারপরে সখীরা নাচিত, বিদূষক নলের সহিত রসিকতা করিত, বনপথে দময়ন্তী স্বামীহারা হইয়া নাকিসুরে কাঁদিত, কালী আসিয়া

তর্জ্জন গর্জ্জন করিত, কানাইলাল সেই সমান অভিনিবেশ সহকারে হাঁ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সব দেখিত, বিশেষ আমোদ অনুভব করিলে, হো হো রবে উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিত, কানাইয়ের হাসির একটা বিশেষত্ব ছিল।

এই অভিনয়ে কানাইলালেরও কিছু অংশ ছিল, সে বড অল্পভাষী বলিয়া তাহাকে আমরা দূতের অংশ অভিনয় করিতে দিয়াছিলাম। বকের পালক আঁটা টুপী মাথায়, নীল রঙের পায়জামা, আর একটা খাটো রঙীন কোট গায়ে কানাই রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে দু' একটা কথা বলার প্রয়োজন থাকিত, তাহাও প্রায় বলিতে পারিত না, কোন গতিকে দূতের প্রবেশ পর্য্যন্তই ঘটিয়া উঠিত। উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতই বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষা করাই ছিল কানাইলালের অভিনয় করার উদ্দেশ্য।

কিছুদিন পরে আমাদের নাট্যসমাজ ভাঙ্গিয়া গেল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অমানুষিক প্রভাব আমাদিগের মধ্যে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিল, দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য জীবন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল : এতদুদ্দেশ্যে কয়জনে মিলিয়া আমরা "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়" নামে একটি সমিতি গড়িয়া তুলিলাম। কানাইলাল এই সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মে মতিগতি দেখিয়াই হউক, অথবা সে নিজেই অধ্যয়নে অধিক মনোযোগী হওয়ায় এই সময় তাহার সহিত আমরা একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি। বলিয়া রাখা ভাল, ধর্ম্ম জিনিষটার উপর কানাইলালের তদ্রূপ আস্থা ছিল না, সে তাহার নিজের সত্য ও চরিত্রবলের উপর ভর দিয়াই চলিত।

তারপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট কলিকাতার রাজপথে সারি দিয়া অসংখ্য যুবক হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীষ মাথায় বাঁধিয়া শোভাযাত্রায় বাহির হইয়াছে ; সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আজিকার রাজপরিষদগণ সেদিন ইংরাজের শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পথে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছেন। সে কি উৎসাহ, সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! দুর্ব্বল, নিরুপায়, পরাধীন বাঙ্গালী, প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিল, বঙ্গভঙ্গ রোধ করা হউক, অন্যথা অসহায় বলিয়া আমরা আর অত্যাচার সহিব না, ইহার প্রতিকার করিব, অস্ত্রহীন জাতি আর নীরব থাকিবে না। হাতে না পারি, ভাতে মারিব, বণিক ইংরাজের ব্যবসা নষ্ট করিব, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিব না, বণিকরাজের পকেটে হাত পড়িলে উহারা বুঝিবে, বাঙ্গালী আর যথেচ্ছাচার সহিতে রাজী নহে, প্রজাশক্তির নিকট রাজশক্তিকে পরাজয় মানিতে হইবে। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে, দেশের কণ্ঠে সেদিন স্বপ্নাতীত স্পর্দ্ধার বাণী গর্জ্জিয়া উঠিল, দেশের দৌর্ব্বল্যবোধ যেন এক নিমিষে তিরোহিত হইল, লক্ষ কণ্ঠের প্রতিজ্ঞা গগন বিদীর্ণ করিয়া প্রতিধ্বনি তুলিল, "বিলাতী দ্রব্য আর স্পর্শ করিব না"—আসমুদ্র হিমাচল "বন্দেমাতরম্" শব্দে মুখরিত হইল। জাগরণের সে নূতন প্রভাত—বাঙ্গালীর প্রাণে আগুন ধরিল; আগুনের ফুল্‌কি দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। আমাদের প্রাণও সে অনলস্পর্শে রাঙা হইয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে চন্দননগরে আসিয়াই দুই-চারিজন বন্ধুর সহিত রুদ্ধ জীবনের ফাঁস খুলিয়া, সেদিন সন্ধ্যার পর নিস্তব্ধ পল্লীর শান্তিভঙ্গ করিয়া আমরাও গাহিলাম, "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" ইত্যাদি। পথের ধারে গবাক্ষ খুলিয়া রোগজীর্ণ, নৈরাশ্যক্ষুব্ধ নরনারী মাতৃবন্দনার এই প্রথম সঙ্গীতে চমকিয়া উঠিল, দেশসাধনার বিজয়মন্ত্রে কেহ কেহ ঘর ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল, কেহ বা উপহাস করিল; বহুদিন পরে আবেগভরা প্রাণে কানাইলাল সৌম্য শান্ত মূর্ত্তিটী লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তার চশমার ভিতর দিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিটি লইয়া বড় আপনার জন বলিয়া যেন পরিচয় দিতে স্থির হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। অবনত শিরে এই নবজাগরণের শুভ মুহূর্ত্তটি জীবনের সবখানি দিয়া বরণ করিয়া লইবার জন্যই যেন সে আজ আমাদিগকে অভিবাদন করিতে দাঁড়াইয়াছিল।

এইরূপে স্বদেশ-সাধনার বহিরঙ্গ অবলম্বন করিয়াই দেশকর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত, বিঘ্নের ইয়ত্তা নাই, তবুও কূলের আশায় আজও কর্ম্মসমুদ্রে সাঁতার দিতেছি—কত মানুষ ডুবিল, কত মানুষ কত পথ ধরিল, কত মানুষ ভীমতরঙ্গের নিষ্ঠুর আঘাতে রক্তাক্ত কলেবরে চিরবিদায় গ্রহণ করিল, অসংখ্য করুণ স্মৃতির বোঝা বহিয়া আজ ভাসিতেছি, কাহার প্রতীক্ষায়? কিসের আশায়? পার করার ভার যাঁর, তাঁর তরী ঐ বুঝি নিশান উড়াইয়া ভাসিয়া আসে, এই অথৈ জলে জাতির কণ্ঠে তাই পরিত্রাণের জয়োল্লাস, তাই অকথ্য নির্য্যাতনের নরকযন্ত্রণারও মুহুর্মুহু মাভৈঃ ধ্বনি গগনে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে।

স্বদেশীর প্রবল বন্যায় আমাদের সেবাধর্ম্ম ভাসিয়া গেল, প্রাণ ফুলিয়া ফুলিয়া আগ্নেয়গিরির মত ফাটিয়া একটা প্রলয় কাণ্ড বাধাইতে চাহিল—সমাজ, ধর্ম, নীতির বাঁধনও সেদিন দুঃসহ যাতনার কারণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, মরা প্রাণে সেদিন যে জোয়ারের ঠেল দিয়াছে,—কূলে কূলে উত্তেজনার ঢেউ উঠিয়াছে, সে যৌবন জলতরঙ্গ রোধ করিবে কে? বাহিরের শক্তি প্রতিপদেই পরাজয় মানিতে আরম্ভ করিল, ঘর ছাড়িয়া দেশের তরুণ পথে বাহির হইল, আসক্তির বাঁধন ছিঁড়িল। বাংলার সে রুদ্রমূর্ত্তি, নব সাধনার নবরূপ দর্শন করা যার ভাগ্যে ঘটে নাই, সে এই নূতন বাংলার পরিচয় জানে না, বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করাও তার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

দরিদ্রনারায়ণ সেবার বড় সাধের আলিপনা দেওয়া মেটে ঘরখানি "সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়" স্বদেশীর জলের তোড়ে উপুড় হইয়া পড়িল। বেদান্ত মঠের শ্রদ্ধেয় অভেদানন্দের বেদান্ত ঘোষণা, কাব্যবিশারদের স্বদেশী বাণী, তাহার উপর অগ্নিযুগেয় ঋষি উপেন্দ্রনাথের অনলবর্ষী বক্তৃতা, সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে একটা প্রলয় বাধাইয়া তুলিল, রাজনীতির গন্ধে অনেক সভ্যই গা ঢাকা দিলেন। বাকী আমরা যে কয়জন রহিলাম, স্বদেশপ্রেমের

মাদকতায় নেশাখোরের মত, উন্মাদের মত, নগ্নপদে, অনাবৃত অঙ্গে, হরিসঙ্কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে স্বদেশী সঙ্গীত গাহিয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলাম। জননী জন্মভূমির প্রতি অনুরাগে প্রীতির সে যে কি মধুময় আবেশ, কি অনির্ব্বচনীয় অমৃতানুভূতি, সে যে না পাইয়াছে, মৃণ্ময়ী জননীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করা তার পক্ষে সম্ভব হইবে না। মাতৃপ্রেমের অফুরন্ত সুধাপানে বিভোর হইয়া সব যখন গলিয়া গিয়াছে, রস টল টল তরল জীবন-সরোবরে কমল যখন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন বড় কঠিন নির্ম্মম আঘাতে আবার এক নবচেতনার সঞ্চারে, স্বপ্নময় জীবনচিত্রখানি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গেল। বাঙ্গালীর তরল, কোমল হৃদয়খানি বজ্রের মত কঠিন হইয়া নব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল,—সেই মূর্ত্তিই বিপ্লব যুগের অঘোরপন্থীর ঘোর রূপ।

আনুষ্ঠানিক স্বদেশীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কানাইলালের সহিত বহু ঘটনায় মিলিত হইয়াছি। সে যত দূরেই থাকুক, যখনই একটা কাজের মত কাজ হাতে পাইয়াছি, তখনই দেখিয়াছি কানাইলাল সহকর্ম্মী রূপে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতি বৎসর পূজার সময় বিলাতী বস্ত্র যাহাতে কেহ খরিদ করিতে না পারে, তাহার জন্য দলবদ্ধ হইয়া আমরা বাজারে পিকেটিং করিতে বাহির হইতাম। কানাইলালকে ইহাতেও আমাদের সহিত যোগ দিতে দেখিতাম। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তৎকালীন দেশনেতৃগণের স্বাক্ষরিত "রাখীবন্ধন উৎসব" করার ইস্তাহার বাহির হওয়া মাত্র আমরা উহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করি। কানাইলাল প্রাতঃকালের শোভাযাত্রা হইতে গঙ্গাস্নান, ফলাহার, রাত্রে সভার কার্য্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে নূতন প্রাণ ঢালিয়া দিত। স্বদেশীর বাহ্যানুষ্ঠানের সকল ক্ষেত্রেই কানাইলালের উপস্থিতি ধ্রুব নক্ষত্রের মতই স্থির ছিল, কোনদিন ইহার অন্যথা দেখি নাই. গভীর আন্তরিকতার সহিত দেশের সকল কার্য্যেই সে যোগদান করিত।

এই প্রসঙ্গে স্বদেশ-সাধনার প্রতি অঙ্গটিকে সে কিরূপ অনুরাগ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিত তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্টের উৎসব একটু সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা হওয়ায় কথা হইল, আমাদের সকল সভ্যই আপন আপন বাড়ী আলোকমালায় সজ্জিত করিবে এবং দ্বারে মঙ্গল কলস পাতিবে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঘরে ঘরে শঙ্খ-ধ্বনি হইবে। কথা কার্য্যে পরিণত হওয়া দুঃসাধ্য হইল না, কিন্তু কানাইলাল বড় বিপদে পড়িল। কানাইয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর নববিধান সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ব্রাহ্ম। তিনি কানাইয়ের এইরূপ অনুষ্ঠানে বিষম বিরক্ত হইলেন, এমন কি কানাইলালের প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলকলস ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কানাইলাল গুরুজনের প্রতি কোনদিন অসম্মানসূচক একটি কথাও উচ্চারণ করিত না, এই ঘটনায় দুঃসহ বেদনায় কাতর হইয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর মধ্যে শয্যা গ্রহণ করিল। তাহার কোমল প্রাণে সেদিন যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করার সময় সে যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে, সে এই সকল অনুষ্ঠান, আড়ম্বরসূচক বলিয়া গ্রহণ করে না, এইগুলির ভিতর দিয়া দেশবাসীর অন্তরে খাঁটি স্বদেশভক্তির রুদ্ধ প্রস্রবণ মুক্ত হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে বলিয়াই তাহার ধারণা। কানাইয়ের অন্তর বেদনায় কাতর হইয়া ৺নন্দকুমার দত্ত, ইনি কানাইয়ের মাতুল, নিক্ষিপ্ত কলস ও কদলীবৃক্ষ বাগানবাটীর দরজায় রক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বদেশানুষ্ঠানের সর্ব্ব স্থানেই কানাইলালের এতখানি আন্তরিক সহযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহাকে পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতাম না, কেমন যেন একটু দূরে দূরে আছে বলিয়া অনুভব হইত, স্বদেশীর গর্ব্বে দৃষ্টি এতখানি অন্ধ হইয়াছিল যে, তাহার প্রতি সংশয় করিতেও বাধে নাই। ভাবিতাম, আমরা যেমন স্বদেশের জন্য সবখানি দিয়া কর্ম্ম করিতেছি, কানাইলাল সেরূপভাবে করিতেছে না, এই ভুল ধারণা, বড় রহস্যময় নাটকীয় ঘটনার

অবতারণায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই কৌতুকপূর্ণ ঘটনা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

স্বদেশীর প্রবল গতি রুদ্ধ করিবার জন্য গোড়া হইতেই রাজকর্ত্তৃপক্ষগণ সচেষ্ট ছিলেন। রিজলী সার্কুলারের মত অনেকগুলি দমননীতি স্বদেশীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর শাসন চলিতেছিল পূর্ব্ববঙ্গে। সার ব্যাসফাইড ফুলারের রাজ্যে অবিচারের অন্ত ছিল না। কিন্তু দেশের মাথায় সর্ব্বপ্রথম বড় আঘাত বাজিল, বরিশাল প্রাদেশিক সভাভঙ্গের ব্যাপারে। ইমার্সন সাহেবের সভাভঙ্গ করার আদেশ অমান্য করায়, সেদিন নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠে পুলিশের লাঠি চলিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধী বালকের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল ও ইংরাজের নগ্ন রূপটী সেদিন সেই প্রথম এমন মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার পর হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ রূপে বাঙ্গালীর হৃদয়ে ইংরাজের স্থান অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এই অপমান বাঙ্গালী হজম করিতে পারে নাই। লাঠির বদলে লাঠি চালাইবার হিংস্র ক্ষুব্ধ বাঙ্গালীকে বড় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। ঠিক এই সময় রৌদ্রে যেমন বালি তাতিয়া উঠে, আমাদের ফরাসী গভর্ণমেণ্টও সেইরূপ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষগণের মত ইঁহারাও "বন্দেমাতরম্" শব্দে মাথা গরম করিয়া বসিলেন। এক ধাতুর গড়ন বলিয়া ইংরাজের সহিত ইঁহারাও সমব্যথী হইয়া পড়িলেন, এবং সে ব্যথার অভিব্যক্তি ইংরাজ রাজ্যের উৎপীড়ন অপেক্ষা আরও ভীমমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। এখানকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ কালা আদ্‌মিকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল। ঘটনা ক্রমে এমন গুরুতর হইয়া উঠিল যে, প্রকাশ্যে পুলিশের সহিত সহরবাসীর দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইল। সে সকল ঘটনার কথা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বলিব। যে কথা বলিতে চাই তাহা

এই একজন শ্বেতাঙ্গ হোটেলওয়ালা পার্শ্ববর্ত্তী সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বাটীর সম্মুখবর্ত্তী গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া অন্তঃপুর মহিলার প্রতি ঘৃণাসূচক ইঙ্গিত করায় তাহাকে উত্তমমধ্যম প্রহার করা হয়। এই উপলক্ষে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই পরিবারের অভিভাবককে বাটী প্রবেশপূর্ব্বক ধৃত করে। সহরে ইহাতে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। সমগ্র সহরবাসী এই উত্তেজনায় বড় উত্তেজিত হইয়া উঠে।

স্বদেশীর প্রবল উত্তেজনায় আমরা তখন একপ্রকার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছি। তাহার উপর এইরূপ ঘটনায় ইহার প্রতিকার করা যেন আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া পড়িল, আর এই অবসরে কানাইলালের স্বাদেশিকতার একটী পরীক্ষা করিয়া লওয়ার লোভ সম্বরণ করিতে পারা গেল না; কাজেই আমি আমার এক বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া কানাইকে একখানি উড়ো-চিঠি পাঠাইয়া দিলাম, তাহাতে লেখা রহিল—"যদি তুমি সত্য দেশসাধক হও, দেশহিতে জীবন বলি দিবার স্পর্দ্ধা থাকে, তাহা হইলে আগামী অমাবস্যার দ্বিপ্রহর নিশীথে শ্মশানের বটবৃক্ষমূলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

সেদিন ঘোর অমাবস্যা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সারাদিক্ আচ্ছন্ন। শীতের রাত্রি। উত্তরে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্মশানের প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষমূলে দুই বন্ধুতে কানাইয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। মানুষের সাড়াশব্দ নাই, ঝিঁ ঝিঁ পোকার বিকট শব্দে কান ঝালাপালা হইয়া যাইতেছিল। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কানাইয়ের ভীরুতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একখানা কালো অঙ্গাবরণে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কানাইলাল সম্মুখে উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই স্বভাবসুলভ উচ্চহাস্যে, নিশুত রাতে প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিল—"বুঝিয়াছি, তুমি ভিন্ন এ কাজ আর কে করিবে? খবর কি?" দেখিলাম, উদ্বেগশূন্য কানাইয়ের প্রসন্ন মুখখানি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাসূচক মহত্ত্বপূর্ণ রেখায়

বড় সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের কি একটা গভীর সঙ্কল্প তাহার ভারি পুরু ঠোঁট দু'খানিতে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে, সত্য সত্যই সম্ভ্রমে যেন মাথাটা স্বতঃই নত হইয়া পড়িতে চাহিল, একটা জোর বাতাসে অঙ্গাবরণ ঈষৎ উড়িয়া যাওয়ায়, কটিবন্ধে একখানা মুক্তফলা খুব বড় চকচকে ছুরি ঝলসিয়া উঠিল, বাঙ্গালীর এই বীরবেশ সেদিন যে রঙ্গমঞ্চেরই সামগ্রী জীবনের জাগ্রত ক্ষেত্রে এ দৃশ্যটী আমার হৃদয়ে দুরু দুরু উৎসাহের সঞ্চার করিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কথা তুলিয়া বঙ্গব্যাপী অত্যাচার ও তাহার প্রতিকারের উপায়টাও এক নিঃশ্বাসে ব্যক্ত করিলাম। কানাই সকল কথা শুনিয়া যে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিল, তাহা উপেক্ষা করার সাধ্য আমার ছিল না। আর আজ স্মৃতির মধ্যে সেই কথাগুলির প্রতিধ্বনি উঠিতেছে, আর ভাবিতেছি—বাঙ্গালী বিপ্লবযুগে অনেক দুঃখেই নরহত্যায় হস্ত রঞ্জিত করিয়াছিল। বাঙ্গালী স্থিরবুদ্ধি উপেক্ষায় অপমানে অবিচলিত থাকিয়াই বীরত্বের নিদর্শন দেখাইতে বাধ্য হইয়াছিল। হায় রে! এ দেব-চরিত্র জাতিটা কার্য্যবশে পরাধীনতার শিকল গলায় পরিয়া জীবনের মহত্ত্ব প্রকাশে অবকাশ না পাইয়াই নরঘাতী হইয়া উঠিল—এমন শান্তিপ্রিয় হৃদয়বান জাতিকে বাঁচিবার জন্যই এমন মরিয়া হইয়া উঠিতে হইল।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে, পবিত্র বটবৃক্ষমূলে, অমাবস্যার অন্ধকারে কানাইয়ের হৃদয়খানি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তখনও বুঝি নাই, কানাইয়ের পরমায়ু এত শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে—বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কানাইয়ের প্রশস্ত ললাটে সাফল্যমণ্ডিত দিব্য জ্যোতিরূপ যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। বড় আশায় বুক বাঁধিয়া উভয়ে উভয়দিকে মুখ ফিরাইয়া কিছুদূর গিয়াছি, অনতিদূরে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া পিছু ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম, অদূরে ভগ্নমন্দির হইতে আরও দুইজন বাহির হইয়া কানাইয়ের সহিত মিলিত হইল। বুঝিলাম—আমরা কেবল গান

গাহিয়া, নিশান উড়াইয়া পথের ধূলায় মাতামাতি করিতেছি, কাজের মত কাজ ইহারা আরম্ভ করিয়াছে, সে কথা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রকাশ করিবার প্রয়াস করিব।

॥ বিপ্লব পথে ॥

কানাইলালের জীবন আলোচনা করিতে হইলে, অঙ্গাঙ্গীভাবে স্থানীয় ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের কথা আসিয়া পড়ে। স্বদেশীযুগে ইঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকজন যুবক একটী দল গড়িয়া তোলেন। এখানে নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চ্চা, স্বদেশ সম্বন্ধে গভীরতর চিন্তা, পৃথিবীর নানা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস আলোচনা প্রভৃতি মানুষ গঠনের যাবতীয় শিক্ষা ও সাধনার চূড়ান্ত অনুশীলন হইত। কানাইলাল চারুবাবুর নিকট থাকিয়া শিকার করা, বন্দুক ছোঁড়া এবং বিশেষভাবে মুষ্টিযুদ্ধে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল।

পাঠকবর্গের নিকট তাহার মুষ্টিযুদ্ধের পরিচয়স্বরূপ দুইটী প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিব।

কানাইলালের শয়ন কক্ষের দক্ষিণ দিকে কয়েক ঘর বারাঙ্গনা বাস করে। প্রতি রাত্রেই এখান হইতে একটা-না-একটা অশান্তি উপদ্রবের কোলাহলে প্রতিবাসী ভদ্রলোকদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিত। গঙ্গানদীর অপর তীরবর্ত্তী চটকলের কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী এইরূপ উৎপাতের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা অধিক মদ্যপানে উত্তেজিত হইয়া প্রায় অর্দ্ধরাত্রে রাস্তায় বাহির হইয়া যথেচ্ছাচার করিত, সাহেব বলিয়া বড় কেহ তাহাদের এইরূপ অনাচারে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না।

কানাইলাল বিরক্ত হইয়া এক রাত্রে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল, তখন সাহেবেরা তাহাদের অভ্যাসানুযায়ী নিঃশঙ্কচিত্তে বিকট চীৎকার ও পৈশাচিক নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কানাইলাল প্রথম তাহাদের

নিষেধ করিল, কিন্তু এই ক্ষীণজীবী যুবকের নিষেধ বাক্য তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিল না, আরও বিকট স্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিল। তিনজন সাহেব ছিল. উহাদের মধ্যে একজন ছিল দৈর্ঘ্যে কানাইয়ের দেড়গুণ এবং প্রস্থে আড়াই গুণ। কানাইলাল প্রথমেই এই ভদ্রলোকের নাকের শিরদাঁড়ায় এক ঘুষি প্রহার করিল, সাহেব তিন পাক ঘুরিয়া নর্দ্দমাশায়ী হইল : অপর দুইজন ব্যাপার সাংঘাতিক বুঝিয়া দৌড় দিল—কানাইলাল তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আর একজনের রগে এক ঘুষি লাগাইল। সে বেচারীও সঙ্গে সঙ্গে ভূমিশায়ী হইল, আর একজন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া কোনরূপে পরিত্রাণ পাইল। এই ঘটনার পর সাহেবদের শুভাগমন আর এ অঞ্চলে বড় দেখা যায় নাই।

দ্বিতীয় ঘটনা এইরূপ : ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে Warren's Cicrus নামে এক সাহেব কোম্পানী চন্দননগরে অভিনয় দেখাইতে আরম্ভ করে, তখন স্বদেশীর প্রভাব. বাংলার তরুণ জীবনে খুবই প্রবলভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছে। বৈদেশিক সার্কাস কোম্পানী দেশীয়দের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লইবে, ইহা আর সহ্য হইল না। এতদ্ব্যতীত বসিবার আসনে সাদা ও কালার মধ্যে একটা গুরুতর রকমের প্রভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল—এই দুই কারণ লইয়া, সার্কাস বয়কট করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা হইল ; সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন যুবক লইয়াই কানাইলাল টিকিট বিক্রয়ের স্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া টিকিট বিক্রয় বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। সার্কাস কোম্পানীর ম্যানেজার সাহেব ইহাতে বিষম বিরক্ত হইয়া কটু ভাষায় কানাইলালকে গালি দিতে লাগিল ; কানাইলালের পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তরও চলিল ; এইরূপ সময়ে অপর এক শ্বেতাঙ্গ, তাঁবুর ভিতর হইতে বাহির হইয়া শ্বেতচর্ম্ম বিশিষ্ট সাহেবের মুখের উপর এইরূপ সমানে জবাব করা বরদাস্ত করিতে না পারিয়া, কানাইলালকে যষ্টি প্রহারে উদ্যত হইল, কানাইলাল ক্ষিপ্রগতিতে তাহার লাঠি এড়াইয়া, বামমুষ্টি প্রহারে সাহেবের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিল, রক্ত বমন করিতে করিতে

ছিন্ন পক্ষ বিহঙ্গের মত সাহেব সাত পাক ঘুরিয়া, দশ হাত দূরে তাঁবু খাটাইবার এক ভূপ্রোথিত খোঁটার উপর পড়িয়া গেল; চারিদিকে হৈ চৈ আরম্ভ হওয়ায়, এবং ব্যাপার কিছু গুরুতর হইতে পারে এই আশঙ্কায়, রক্তাক্ত সাহেব মরিল কি বাঁচিল তাহা আর দেখা হইল না, কানাইলাল সদলবলে সরিয়া পড়িল। তারপর স্থানীয় পুলিশ আহত সাহেবকে হাসপাতালে পাঠাইল, প্রহারকারীর অনুসন্ধানও চলিল, কিন্তু বিদেশী সার্কাস কোম্পানী অনর্থক ব্যবসা মাটি করিয়া চন্দননগরে বসিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে বুঝিয়া, তার পরদিন পাত্‌তাড়ি গুটাইয়া প্রস্থান করিল। তরুণ মহলে একটা জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল।

মুষ্টিযুদ্ধের মত কানাইলালের বন্দুকের টিকও অব্যর্থ ছিল। তাহার পরিচয় নরেন্দ্রনাথের হত্যার ব্যাপারে দেখা গিয়াছে। এই সকল গুণ ব্যতীত কানাইলাল একজন পাকা ঐতিহাসিক হইয়া উঠিয়াছিল। চারুবাবুর সাহচর্য্যে সে ভারতের ইতিহাস চর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিত। আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস তাহার একপ্রকার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল, রুষিয়ার নিহিলিষ্ট রহস্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে অধিকার করিয়াছিল, বিপ্লববাদীদের কঠোর সত্যনিষ্ঠ চরিত্র-কথা আলোচনা করিতে তাহাকে বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে দেখিতাম।

ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান পরিস্ফুট ছিল; বিপিনচন্দ্রের **"New India"** কাগজ কানাইয়ের বড় প্রিয় ছিল। তাহা ছাড়া, **"Bande Mataram"**, "সন্ধ্যা", "যুগান্তর" সে অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিত। দেশের অবস্থা ও দৈনন্দিন ঘটনা লইয়া, সহপাঠী বন্ধু ও সহতীর্থদের সহিত সর্ব্বদাই জীবন্ত আলোচনা করিতে সে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিত। কোন কোন বিষয় লইয়া, তাহার মীমাংসায় আসিতে বন্ধুদের সহিত যুক্তি-তর্কে কতবার দিবারাত্র কাটিয়া গিয়াছে। রাত্রে কানাইলালের নিদ্রা ছিল না, দিবাভাগে সংবাদপত্রাদি পাঠ ও তর্কবিতর্কে সময় তাহার

কাটিয়া যাইত, চিন্তা করিতে করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিলে, অঞ্জলি অঞ্জলি জল লইয়া মাথায় থাবড়াইয়া দিত; দীর্ঘ কেশ, ডাগর ডাগর চক্ষু, উন্নত গ্রীব কানাই, তখন যে কি লইয়া এত চিন্তা করিত তাহা আমরা বুঝিতাম না। পড়াশুনায় তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। বি. এ. পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে, সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পড়িতে বসে, আহার নিদ্রা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াই সে পরীক্ষার জন্য এই এক মাস সময় একান্তে অতিবাহিত করে; পরীক্ষায় কানাই উত্তীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু নরেন্দ্রনাথের হত্যাপরাধ প্রমাণ হইলে, গভর্ণমেন্ট তাহার ডিগ্রী কাড়িয়া লয়—কানাই মৃত্যুরই কণ্ঠহার পরিয়া যে গৌরব লাভ করিয়াছে, বি. এ. উপাধি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ।

কানাই চিরদিনই নির্ভীক, সত্যানুরাগী, দুষ্কৃতদমনকারী; তাহার হৃদয়-বৃত্তি তাই বলিয়া বজ্রের মত কঠোর ছিল না, তাহার কোমল হৃদয়ে তরল স্পর্শটুকুর বেশ একটা মাদকতা ছিল, কানাইলালকে আপনার করিয়া লইতে কাহারও বাধিত না। কানাইলালের একটি বিশেষ গুণ ছিল তাহার নিরহঙ্কারিতা, অতি তুচ্ছ কাজেও, কানাই সবখানি ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইত না; দেশের ছোট বড় সকল কাজেই তাহাকে অগ্রণী দেখিতাম। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে Burn & Co-র অফিস হইতে দেশীয় কর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘট করিয়া যেদিন বাহির হইয়া আসিল, স্বদেশীর ইতিহাসে সেও বড় কম গৌরবের কথা নয়। গোলামের জাতি, সেই প্রথম আত্মমর্য্যাদায় আঘাত পাইয়া, গোলামী ত্যাগ করিতে সাহসী হইয়াছিল, তারপর এই সকল ছাপোষা কেরাণীবৃন্দের সংসার চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিলে, দেশের নেতৃবৃন্দ, দেশীয় ভ্রাতৃগণের জন্য, বোধহয় দেশাত্মবোধের এই প্রথম পরিচয়স্বরূপ এক সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। চারুবাবুকে কেন্দ্র করিয়া, কানাই-লাল ইহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিল। চন্দননগরে যে প্রথম বিরাট স্বদেশী সভার অধিবেশন হয়, কানাইলাল তাহাতেও একজন অগ্রণী উদ্যোগী

ছিল—দেশের কোন কার্য্যেই কানাই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে নাই। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে যে সেবকদল সংগঠনের সাড়া পড়ে, ইহার পূর্ব্বে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে ত্রিবেণী স্নান ঘাটে স্নানার্থীদের সাহায্যার্থে কানাইলালের চেষ্টায় সেবক সঙ্ঘ গঠিত হয় এবং এই সেবা-কার্য্যের বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইলে পরবর্ত্তী অর্দ্ধোদয় যোগে সেবক সঙ্ঘ গঠনের উৎসাহেই ইহা যে যৎকিঞ্চিৎ ইন্ধনস্বরূপ সহায়তা করিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অর্দ্ধোদয় যোগে চন্দননগরেও এক বিপুল সেবকবাহিনী গঠিত হয়, কিন্তু কানাইলাল এই সময়ে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়ায়, সে ইহাতে যোগ দিতে পারে নাই, এইজন্য সে বার বার দুঃখ প্রকাশ করিত।

ম্যালেরিয়া জ্বরে কানাইলাল বড় কষ্ট পাইয়াছিল, কিন্তু একান্ত শয্যা-গ্রহণ না করিলে, এক জোড়া ছিন্ন মলিন মোজা পরিয়া সে সর্ব্বদাই থাকিত ও একখানা আলোয়ান গায়ে দিয়া নানা কার্য্যে ঘুরিয়া বেড়াইত, একদিনের আশ্চর্য্য ঘটনায় সে আমাদের চমৎকৃত করিয়াছিল।

চন্দননগরে একবার ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ যখন আমাদের কাণে পৌঁছিল, তাহার কিছু পূর্ব্বে, কানাইলালকে প্রায় ১০৫ ডিগ্রী জ্বরে বিছানায় বেঁহুশ হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখি, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার দগ্ধ মুখে, চালের মটকায় দাঁড়াইয়া, পরমোৎসাহে জল ঢালিতেছে; প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা, বহু লোকের অসাধারণ পরিশ্রমের পর অগ্নি মন্দতেজ হইয়া আসিলে, কানাইলাল নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল, তারপর আমার কাঁধের উপর ভর দিয়া বাটী আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। দেশের দুঃখে, সে জীবনের সুখ সোয়াস্তি কোনকালেই ভ্রূক্ষেপ করিত না। তাহার এই জ্বরাবস্থায় দুঃসাহসিক অগ্নি নির্ব্বাপণের ঘটনার সহিত, নরেন্দ্রনাথের হৃৎপিণ্ড বিদারণ কালের ঘটনা যুগপৎ মনে পড়ে, সেই সময়ও কানাইলাল জ্বর ভোগ

করিতেছিল। সে জ্বরও ১০৫-এর কম হইবে না। শারীরিক অসুস্থতা তাহার উদ্দেশ্য সাধনের বিঘ্ন বলিয়া সে কোনদিন চিন্তা করিত না।

কানাইলালের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির মধ্যে শিক্ষা করিবার যথেষ্ট উপকরণ আছে, তাই এইগুলির উল্লেখ করিলাম। দেশপ্রীতি তার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দেশসেবায় উদাসীন থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। বিশেষ কথা এই যে, দেশের অতি ক্ষুদ্র কার্য্য সাধনেও সে প্রাণকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিত, এইজন্যই প্রাণ দিতে কানাইলালের কোন কুণ্ঠা আসে নাই। ফাঁসির হুকুম তাহার হৃদয়ে এক বিন্দু ভীতির সঞ্চার করিতে পারে নাই, প্রাণ দেওয়ার সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

বাংলার স্বদেশী বাংলার দেশাত্মবোধকেই জাগাইয়া দিয়াছিল, বাংলার তরুণ দেশপ্রীতির সাহায্যে লুপ্ত আত্মবিশ্বাসকেই ফুটাইয়া তুলিতেছিল, দেশভ্রাতৃগণের মধ্যে একাত্মানুভূতি জাগাইয়া, দারুণ অনৈক্য দূর করিয়া ভাই ভাই এক ঠাঁই হইবার উপক্রম করিতেছিল। দেশসাধকের হৃদয়ে রক্ত পিপাসার কালানল তখনও জ্বলে নাই। রাজকর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্ধত আচরণ ও অকারণ কঠোর শাসনের ফলেই, প্রতিহিংসার বহ্নি বাংলার হৃদয়ে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বরিশালের সভা ভঙ্গের ফলে দেশের প্রাণে বড আঘাত লাগিয়াছিল, সংবাদটি দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িলে একজন বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীর মুখ হইতেই বাহির হইয়াছিল, 'দেশে কি এমন লোক নাই প্রাণ দিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে পারে'। তখন কে জানিত বাঙ্গালীর হৃদয় মথিয়া ইহাই তখন জাতির মর্ম্মকথা, তখন কে জানিত গোপনে বারীন্দ্রকুমার এই নরমেধ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

এই বরিশালের ঘটনার উপলক্ষ করিয়াই, বারীন্দ্রকুমারের গুপ্ত সমিতির কথা চন্দননগরের তরুণমহলে আসিয়া পৌঁছায়। কথাটা কানাইলালের মত উপেন্দ্রনাথেরও কর্ণগোচর হয়। উপেন্দ্রনাথ তখন পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের

পৃষ্ঠে যষ্টি প্রহার করিয়া ঘুমাইতে সচেষ্ট ছিলেন। দেশটা ইংরাজের নহে, কেননা এ প্রহার নিবারণ করা ইংরাজের সাধ্যে যখন কুলায় না, দেশের লোকের দয়ার উপরই নির্ভর করে, তখন এ দেশ আমাদের—এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন, ভারতের সর্ব্বত্র, বড বড় সহরে বিপ্লব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাংলার জেলায় জেলায় প্রতি টাউনে অন্ততঃ বারজন করিয়া দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তিনি আশায় আনন্দে কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া উল্কার মত কলিকাতায় বারীন্দ্রকুমারের সহিত গিয়া সংযুক্ত হইলেন। উপেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী লেখনী "যুগান্তর" ছত্রে ছত্রে অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। কানাইলাল কথাটা কিন্তু তেমন করিয়া তলাইয়া বুঝিল না। স্বদেশহিতৈষণার মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা থাকা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু গুপ্ত সমিতি গঠনের চিন্তা তখনও তরুণ বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে তেমন জোর শিকড গাড়িতে পারে নাই, স্বদেশজাত দ্রব্যে দেশের লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি করা, সভা-সমিতির অনুষ্ঠান এবং দুঃস্থ পীড়িত দেশবাসীর সাহায্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া, এই দুই ভাবে তখন দেশের প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিত। কানাইলাল এইভাবেই দেশসাধনায় আত্মদান করিয়া তৃপ্ত ছিল।

কিন্তু ঢাকার নবাব সলিমুল্লার হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচারের ফলে, ময়মনসিংহ কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু প্রজার উপর অশিক্ষিত মুসলমান প্রজার অমানুষিক অত্যাচার সংবাদ, বাঙ্গালীর স্বদেশ-সাধনার গতি নিম্নমুখী করিয়া দিল। বিশেষ জামালপুরে বাসন্তী প্রতিমা যেদিন মুসলমান ভ্রাতৃগণের হস্তে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল, হিন্দু রমণীগণ পথে-ঘাটে সর্ব্বস্ব হারাইয়া মাটির বুকে লুটাইয়া পড়িল, সেদিন অমন দধির মত বাঙ্গালীর শীতল রক্ত অগ্নিদীপ্ত হইয়া বাঙ্গালীকে প্রতিশোধ লইতে পাগল করিয়া তুলিল। ঠিক এই সময়ে বিপ্লববাদিগণ ময়মনসিংহে লোক পাঠাইয়া একেবারে কয়েকটা মুসলমানের গ্রাম, বোমার চোটে উড়াইয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে চাহিলেন; এই সংবাদে কানাই উদ্বুদ্ধ হইয়া বিপ্লব-নীতিকে হৃদয়ের সহিত বরণ করিয়া

লইল। ইত্যবসরে যাহারা জামালপুরে বিপ্লব-সমিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা পুলিশে ধৃত হওয়ায় সে ক্ষেত্রে আর জামালপুর যাইয় কানাইয়ের কার্য্য সাধন করা হইল না, কিন্তু এই সময় হইতে কানাইলাল বিপ্লবপন্থী হইয়া উঠিল। বিপ্লবানুষ্ঠানে তাহার কার্যাপদ্ধতি কি আকার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আমি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব।

॥ বিপ্লব যজ্ঞে ॥

স্বদেশীর স্রোত সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। স্বদেশকর্ম্মীদের অন্তরে ধূমায়িত বিপ্লব-বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল। কর্ম্মের স্পষ্ট ঋজুগতি ক্রমেই বঙ্কুর তির্য্যক পথে ছুটিল। কেহ কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিয়া বলে না। যেন পরস্পর পরস্পরকে আড়াল করিয়া চলিতে চাহে; প্রথম প্রথম ইহার অর্থ বোঝা যায় নাই, কিন্তু একদিন প্রাতঃকালে, সংবাদপত্রের স্তম্ভে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে এ্যালেন সাহেবের হত্যা-চেষ্টার কথা পাঠ করিয়া দেশে যে কি গুরুতর বিষয় লইয়া ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহার যেন একটা অস্পষ্ট আভাষ পাইলাম। সবিস্ময়ে কানাইলালের দিকে চাহিতেই সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি দেখিতেছ?" আমি বলিলাম, "এ সব কি? এ যে স্বপ্ন!" কানাই হো-হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "এমন স্বপ্ন এখন হইতে নিত্য দেখিবে।"

এইরূপ ঘটনায় ভাল কি মন্দ ফল ফলিবে, তাহার বিচার করিবার মত অবস্থা তখন দেশের তরুণদের ছিল না। উপর্য্যুপরি কয়েকটী ঘটনায় তরুণ প্রাণে জিঘাংসাবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; বিশেষ ঢাকার নবাব সলিমুল্লার হিন্দু-বিদ্বেষ হিন্দু-বাঙ্গালীর প্রাণে বিষ ছড়াইয়া দিতেছিল। বাঙ্গালী স্বীয় দৌর্ব্বল্য, আততায়ীর রক্তচিহ্নে ঢাকিয়া ফেলার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত হইতেছিল। সংবাদপত্রে এইরূপ ঘটনার কথা বাহির হইলে, দেশবাসী পরম আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিত।

তখন সকলেই একদল লোককে প্রত্যক্ষে না হউক, মনে মনে এইরূপ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ দেখিলে আশ্বাস পাইত, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত এবং নিরাপদ স্থানে বসিয়া উৎসাহ দিতেও কসুর করিত না।

গোয়ালন্দ ষ্টেশনের এই লোমহর্ষণ ঘটনার পর কুষ্টিয়ায় পাদরী হিকেন বোথাসের উপর গুলী চলিল। বাঙ্গালী যে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইয়াছে, এই গর্ব্বে বাংলায় এক নূতন উত্তেজনার স্রোত বহিতে লাগিল। কোথায় কি হইতেছে, কে কি কথা কহিতেছে তাহার দিকে শ্রবণ, নয়ন, সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কলিকাতার রাজ-পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুইজন নবীন যদি চুপে চুপে কথা কহিত, মনে হইত, কি হত্যার ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। প্রথম প্রেমের মত হিংসার মোহন স্পর্শে বাংলার তরুণ সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিল। একত্রে কয়জন বন্ধু চলিতেছি, হঠাৎ একজন বলিয়া বসিল, একটু ঐদিকে যাওতো, আমাদের একটা গোপন কথা আছে। ক্ষুব্ধ অথচ আশঙ্কিত হৃদয়ে দূরে গিয়া দাঁড়াইতাম, কেননা এই সোনার স্বপ্নে নিজেকে জড়াইয়া দিতে পারি নাই; আশঙ্কা কোন এক নূতন কাণ্ড বাধাইবার অব্যর্থ পরামর্শ চলিয়াছে, বিপ্লবপন্থীদের এইরূপ আচরণের নিগূঢ় অর্থ, উৎকণ্ঠায়, কৌতূহলে মানুষ সহজেই ফাঁদে আসিয়া পড়িবে। ঘটিতও তাই।

রাজকর্ত্তৃপক্ষগণ স্বদেশীর বিরুদ্ধাচরণ করিলে, উহার নির্ম্মম প্রতিশোধ প্রবৃত্তি নবীনদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত তাহা নিম্নলিখিত ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হইবে।

১৯০৭ সালের শেষাশেষি—চন্দননগরের হাটখোলা নামক স্থানে এক স্বদেশী-সভা করার আয়োজন হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সে সভায় আহুত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের খেয়াল হইল, সে সভা বন্ধ করিতে হইবে। সভাক্ষেত্রে অসংখ্য লোক উপস্থিত, বিশ-পঁচিশজন মাদ্রাজী সিপাহী বন্দুক কাঁধে সভাক্ষেত্র ঘিরিয়া ফেলিল।

তৎকালীন মেয়র মঁসিয়ে তার্দ্দিভেল ইহার অধিনায়ক ছিলেন। যুবক মহলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তাহারা বাছা বাছা কয়েকজন মিলিয়া একটা পোড়ো বাড়িতে সভা বসাইয়া দিল। অনূ্যন শতাধিক যুবক সে ক্ষেত্রে একত্রিত হইয়াছিল। সভায় স্থির হইল, বড সাহেবের বাড়ী আক্রমণ করিতে হইবে। কথামাত্র উদ্যোগ চলিল. লাঠি. সড়কী, বন্দুক, খাঁড়া সংগ্রহ হইতে লাগিল। ব্যাপার যখন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, তখন কানাইলাল প্রমুখ কয়েকজন যুবক আসিয়া ইহাদের নিরস্ত করিল এবং ইহার প্রতিকার পরে হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিল। দেশকর্ম্মে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই যুবকগুলির কথায় কেহ অবিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু উৎসাহ-ভঙ্গে, ক্ষুণ্নমনে সকলেই একে একে স্থান পরিত্যাগ করিল। মঁসিয়ে তার্দ্দিভেলের এই কর্ম্মে প্রতিশোধের যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা প্রাণঘাতী। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে, তাহার শয়ন কক্ষে বোমা নিক্ষেপেই দেশের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। বাধার বিরুদ্ধে এরূপ প্রচণ্ড আঘাত দিবার প্রবৃত্তি বিপ্লবপন্থীদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছিল।

স্বদেশীর খরস্রোত মোড় ফিরিয়া এমনই ভাবে উদীয়মান জাতীয় শক্তিটাকে বিপ্লব অভিমুখী করিয়া তুলিল ; বারীন্দ্রকুমার উপযুক্ত সময়েই হোতার আসন অধিকার করিয়াছিলেন, দেশের প্রাণে স্বতঃই আগুন ধরিয়াছিল, বারীন্দ্রের ঘৃতাহুতিতে তাহা আরও অসংখ্য শিখায় জ্বলিয়া উঠিল মাত্র।

নারায়ণগড়ে ছোটলাটের গাড়ী বোমার আঘাতে উড়াইয়া দিবার আয়োজন যেমন মানুষের প্রাণে উত্তেজনার সৃষ্টি করিত, সেইরূপ কুমিল্লার মুসলমান অত্যাচারে উদ্বুদ্ধ দেশবাসীর হস্তে অগ্নিনালিকার ভীম গর্জ্জনও মানুষকে পাগল করিয়া তুলিত, তখন ঘা খাইয়া নীরব থাকাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে যুগে ঢিলের বদলে পাটকেল ছোঁড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

অসংখ্য বিবরণে প্রতিদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভ ভরিয়া যাইত, উত্তেজনার অবধি থাকিত না। মরণপথে ঠেলাঠেলি পড়িয়া যাইত।

কানাইলাল বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া ইহার আশা ও উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। পড়াশুনায় আর তেমন মনোযোগ দিতে পারিল না, সর্ব্বতোভাবে আপনাকে এই কার্য্যে ঢালিয়া দিল। ভারতের স্বাধীনতা-স্বপ্ন স্বর্ণজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। ব্রিটিশ-সিংহ ইহার অন্তরায় স্বরূপ কিরূপ বীরদর্পে নাক গাড়িয়া বসিয়া আছে, সে দিকটা তখন আমলেই আসিত না, যেন একটা প্রবল স্রোতে গা ভাসান দিতে পারিলেই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগিত। স্বপ্ন হউক, তবুও তাহাতে সুখ ছিল, স্বস্তি ছিল। মনে হইত, এই অসংখ্য ভারতবাসী বারুদের গাদা হইয়া আছে। দুই একটি বোমা ফাটাইতে পারিলেই মুষ্টিমেয় বিদেশী তল্পিতল্পা গুটাইতে বাধ্য হইবেই, অধিকন্তু এই ত্রিশকোটি নরনারী স্বাধীনতার সংগ্রামে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় হইত না।

বারীন্দ্রকুমারের আহ্বান চন্দননগরে পৌঁছিলে আবার একটি নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। ভাঙ্গাচুরা যে কয়েকটা বন্দুক, রিভলবার সংগ্রহ হইল, তাহা বিপ্লব-সমিতির কেন্দ্র কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ রাজ্যের উচ্ছেদ কামনায় বারীন্দ্র-কুমারের উদ্যোগপর্ব্বের একটা চিত্র, যাহা শুনিয়াছি, তাহা বিবৃত করার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

বিপ্লব-সমিতির মুখপাত্র "যুগান্তর" অফিস তখন চাঁপাতলার গলিতে, ঠিক মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণে। একজন সঙ্গী সহ কানাইলাল খানিকটা বারুদ (Gun powder) সংগ্রহ করিয়া একদিন সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একদিকে তো সংবাদপত্র পরিচালনার কার্য্য চলিয়াছে, অন্যদিকে বারীন্দ্রকুমার সোডার বোতল ঠাসিয়া বারুদ গাদিতেছেন।

বোমা তৈয়ারী করার ইহাই হয়তো আদিপর্ব্ব। অন্যান্য লোকজনের গমনাগমনে বড় বাধা নাই, কিন্তু সহরের অসংখ্য কর্ম্মকোলাহলের আড়ালে, বিপ্লবসূচনার এই উৎকট আয়োজন তখন বাঙ্গালীর কল্পনার মধ্যেই ছিল না। যাহাই হউক, প্রকাশ্যে রাজনগরীর বুকের উপর বসিয়া বারীন্দ্রকুমারের এই দুঃসাহস সে যুগে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে।

শুনা যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় চন্দননগরে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এই আশ্রমে দেশের যুবক-চরিত্র জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া নব-জাতির ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার ধারণা, ইংরাজ রাজ্যে এইরূপ অনুষ্ঠান অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। তাই চন্দননগরের কথা তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। বারীন্দ্রকুমার কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক মরণ-যজ্ঞের আয়োজন ইংরাজ রাজ্যেই সম্ভব করিয়াছিলেন; তাহার কারণ, বারীন্দ্রকুমারের উদ্বুদ্ধ প্রাণশক্তি কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধায় বিচলিত হইত না। দূর-দর্শনের তোয়াক্কা রাখিত না, তাই তিনি বাংলায় বিপ্লবের বীজ বপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আর উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্কল্প হাওয়ার জগতেই বিচরণ করিল। মাটিতে আর শিকড় গাড়িতে পারিল না। তবে তাঁর "সারস্বত আয়তনের" স্মৃতি আজও আমাদের অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই।

বিপ্লব সমিতিকে দেশব্যাপী করিয়া তুলিবার জন্য কানাইলাল প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিল। চন্দননগরের প্রান্তে প্রান্তে খোঁটা পুতিয়া সহরব্যাপী বিপ্লবের জাল বুনিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। কানাইয়ের কর্ম্ম তখনকার পক্ষে একান্ত ব্যর্থ হয় নাই।

কানাইলালের মন্ত্রগুপ্তি অসাধারণ ছিল। সহজ ও সরলভাবেই সে সকল কার্য্য করিয়া যাইত, তাহার অন্তরগত সঙ্কল্পের কথা জানা যাইত না। এইজন্য কানাইলাল মানিকতলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ধৃত হইলে, তাহার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুও চমৎকৃত হইয়াছিল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কানাইলাল চন্দননগরে প্রায় পাঁচ ছয়টী সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। মূল কেন্দ্র ছিল তাহার নিজ বাটীতেই। সেখানে রীতিমত ব্যায়ামচর্চ্চা চলিত, বিশেষভাবে লাঠি খেলার ধূম পড়িয়াছিল। মার্ত্তাজা নামক এক ব্যক্তির নিকট সে লাঠি খেলায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া ভদ্রলোকের ছেলেরা লাঠি খেলায় আগাইয়াছে দেখিয়া অনেক বাগ্দী জাতীয় পাকেরা সমিতিতে আসিয়া লাঠি খেলা শিক্ষা দিত। পাড়ায় পাড়ায় প্রতিদিন অপরাহ্ণে ঠকাঠক লাঠির শব্দে মনে বেশ আনন্দের সঞ্চার হইত। সকল শ্রেণীর লোক লইয়াই সমিতি-গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিপ্লবের যে কোন সংশ্রব আছে, তাহা কানাইয়ের আচরণে বুঝা যাইত না। তবে ইহার মধ্যে তার যে একটী সুদূর কিছু লক্ষ্য আছে, তাহা মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়িত, কিন্তু আসল ব্যাপারটা অবস্থা বুঝিয়া সে এমনভাবে চাপা দিত যে, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপনের আর অবসর থাকিত না। আমার মনে পড়ে সমিতির যে রবিবাসরীয় অধিবেশন হইত, তাহাতে দুই একজন রাজকর্ম্মচারীও যোগ দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। সেখানে দেশের কথা, ধর্ম্মের কথা, ইতিহাসের কথা আলোচনা হইত।

যে সকল যুবক বিপ্লব ব্যাপারে সংলিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কথা উঠে যে, প্রতি বিপ্লবপন্থীকেই পদভ্রমণে বাংলা দেশে ঘুরিয়া আসিতে হইবে। দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ইহাই একটী উপায় মাত্র। কলিকাতার কেন্দ্রে কথাটা তেমনভাবে গৃহীত হয় নাই। কানাইলাল কিন্তু কয়েকজন বন্ধুর সহিত এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। প্রায় ৬০ মাইল ভ্রমণের পর এক পরিচিত গোয়েন্দা পুলিশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাহাদের এইরূপ ভ্রমণ, রাজকর্ত্তৃপক্ষের সংশয়ের কারণ হইতে পারে, এই যুক্তিপ্রদর্শন করেন, ভাবী কর্ম্মের বিঘ্ন সম্ভাবনা বুঝিয়া কানাই সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দেই বারীন্দ্রকুমার "যুগান্তর"-এর সংশ্রব ছাড়িয়া মানিকতলার বাগানে কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কার্য্যে তিনি তাঁহার পরিচিত বন্ধুদের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিয়া পাঠান এবং ঘর-সংসার ছাড়িয়া যুবকদের সেখানে আহ্বান করেন। কানাইলালের তখন বি. এ. পরীক্ষা দিবার সময়। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের পীড়াপীড়িতে কানাই এই সময়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু বি. এ. পরীক্ষার পর কানাই ও অপর একজন যুবকের বারীন্দ্রকুমারের কার্য্যে যোগ দেওয়া একপ্রকার স্থির হইয়া যায়।

চন্দননগরের যে দুই চারিজন যুবক বিপ্লবযজ্ঞে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সকলেরই তখন ছাত্রজীবন, আর্থিক অবস্থা কাহারও বড় ভাল ছিল না। তাছাড়া চন্দননগরের বিপ্লবপন্থীদের মন্ত্রগুপ্তি এত গভীর ছিল যে, কাহারও তাহার তলস্পর্শ করিবার সাধ্য ছিল না, এবং ইহারাও সাধ্যপক্ষে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। এইরূপ শুনিয়াছি বারীন্দ্রকুমারের অর্থ প্রার্থনা—প্রথম মাসে মাত্র পাঁচ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল। তারপর দশ টাকা ক্রমে পণর টাকা পর্য্যন্ত ইহারা সংগ্রহ করিয়াছিল। কথাটা আজ কিছুই নহে কিন্তু সেদিন এই ক্ষুদ্র কার্য্যে যুবকের প্রাণে কি আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইত, তাহা উপলব্ধির সামগ্রী। ইহার ভিতর দিয়াই ভবিষ্যৎ দেশের উন্মত্ত চিত্রখানি ফুলিয়া ফুলিয়া চক্ষে ধরা দিত বলিয়াই প্রাণ দিতে তাহাদের কৃপণতা ছিল না।

অর্থ সাহায্যের কথা লইয়াই কানাইলাল আমার নিকট ধরা দিয়াছিল। কানাইয়ের এই আত্মদানের করুণ কাহিনী শেষ করিবার পূর্ব্বে সেদিনের সেই নূতন পরিচয়ের চিত্রখানি আজও যাহা জ্বলন্ত রেখায় আমার মর্ম্মে ফুটিয়া আছে তাহা পাঠকদিগকে উপহার দিব।

সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি। মাঘ অথবা ফাল্গুন মাস হইবে। শীতের আমেজ তখনও আছে। হঠাৎ কানাই আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত

হইল—বেশ মুক্তভাবেই কথা আরম্ভ করিল। সকল বাঁধন সেদিন সে টুটাইয়াই আসিয়াছিল।

কথাপ্রসঙ্গে উভয়েই বেশ উত্তেজিত হইয়া পড়িলাম। কথা দেশের প্রসঙ্গ লইয়া, ঘরে থাকা গেল না। বাহিরে আসিয়া কথা হইল। তারপর প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। ঠাণ্ডা বাতাসে চাঁদের আলোয় বেশ সুখস্পর্শে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কানাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথা কহিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম—সে যেন আজ একটী নূতন মানুষ। কি প্রফুল্ল উদার ছবিটি তার মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেদিন। সে বড় আত্মীয় বলিয়াই বোধ হইল। এমন কুণ্ঠাহীন কথা, এমন উদার ভাব ও আচরণ, অন্য লোকের নিকট কোনদিন পাই নাই। আমি যেন কথায় কথায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, হৃদয়টাও গলিয়া পড়িল—কানাই ঠিক এই সময়ে অধিকতর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথার উপসংহারে বলিয়া উঠিল, "এই আমাদের দেশ, ইহার স্বাধীনতা চাই এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থাও চলিতেছে খবর রাখ কি?" আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। পুলকে, বিস্ময়ে, কানাইয়ের মুখের দিকে চাহিলাম, কথা প্রতি বর্ণে বর্ণে আগুনের মত সত্য, পাহাড়ের মত শক্ত, দৃঢ়, কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে বাধিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায়? কে করিতেছে? কানাই বলিল, "সে কথা এখন বলিব না। জানিও বঙ্কিমের আনন্দমঠ আজ স্বপ্ন নয়, উপন্যাস নয়, অসংখ্য সন্তান একত্র হইয়া মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লইতেছে, আমিও যাইব, তোমার সাহায্য চাই।"

ঋষি বঙ্কিমের জন্মপীঠ মনে পড়িল, মনে পড়িল খুব সম্ভব ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উপাধ্যায়ের উদ্যোগে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমের পুণ্যভবনে, মহেন্দ্রের দীক্ষা অভিনয় প্রান্তর সম্মিতির কৌতুক যুদ্ধ, স্বদেশের প্রীতিমহোৎসব, সেদিন কানাইয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া সারাদিন সে উৎসবের আনন্দ ভোগ করিয়া-

ছিলাম ; আজ আর সে উৎসব নয়, সত্যই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে ; কানাইকে অবিশ্বাস করা যায় না।

সত্য কথা বলিতে যদি অপরাধ না হয়, তাহা হইলে বলিব, সেই মুহূর্ত্তে কানাই আমার প্রাণের দাবী করিলে, আমি অবহেলে তাহা দিতাম কিন্তু সে এত কথা বলিয়া যাহা চাহিল, তাহা বড় তুচ্ছ এবং সামান্য।

যাই হোক কানাইকে সেইদিন চিনিলাম এবং সেই শেষ দেখা—তারপর বন্দীবেশে তাহাকে দেখিয়াছি, সে কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজ তার মুক্ত আত্মা—কোন্ যোজন যোজনান্তরে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ঘুরিতেছে কে জানে, ভারতের মুক্তি যে উপায়েই হউক, কানাই স্বাধীনতার উপাসক, স্বাধীনতার মন্ত্রই তার জীবনের মন্ত্র।

॥ বাল্য কাহিনী ॥

আর দুই চারিটি কথা মাত্র। ধরিত্রীর বুকের ফুল যেমন সহজভাবে ফুটিয়া উঠে, সাধারণ মানুষের মত কানাইলালও একদিন জননীর কোল আলো করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কৃষ্ণাষ্টমীর ঘনঘটা রজনীতে, সেদিন শুভদিন বলিয়া হিন্দুদের নিকট চিরস্মরণীয়—তাই কানাইলালের জন্মতিথি ভুলিবার উপায় নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমী তিথিতে কানাই জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য কানাই—কানাই ; নতুবা তার জ্যেষ্ঠ সহোদর যখন আশুতোষ, তখন বাঙ্গালীর অনুপ্রাসপ্রীতিনিবন্ধন তার নাম ভবতোষ কি অন্য কিছু রাখা হইত। শুনা যায় কানাইয়ের নামকরণও হইয়াছিল সর্ব্বতোষ নামে, কিন্তু সে নাম সূতিকাগারের বাহিরে আর পৌঁছাইতে পারে নাই।

চার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই, পিতার কর্ম্মস্থল, বোম্বাই সহরে কানাইলালকে লইয়া যাওয়া হয়। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, একাদিক্রমে কানাই বোম্বাই সহরে বাস করে। আর্য্য হাই স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া

দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কানাইকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারা নিজের ব্যয়েই ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া কানাইকে উপহার দিতেন।

নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে কানাই একবার চন্দননগরে আসে এবং এক বৎসর স্থানীয় ডুপ্লে কলেজে পড়াশুনা করে। সেই সময় হইতেই তাহার পোষাক পরিচ্ছদ ও আহারাদি ব্যাপারে ঔদাসীন্য দেখা যায়। ইহার পর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানাইলাল বোম্বাইয়ে থাকিয়াই পড়াশুনা করে।

কানাইয়ের সহপাঠী দরিদ্র যাহারা, তাহাদের সহিত সে মিশিতে অধিক ভালবাসিত, এবং তাহাদের আপন করিয়া লওয়ার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। বাল্যকালের মত যৌবনেও কানাইয়ের এই গুণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। দরিদ্র বালকদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা অধিক ছিল বলিয়া নিজের আহারাদি ও পোষাক পরিচ্ছদের সাচ্ছল্য ও প্রাচুর্য্য থাকিলেও সমবয়স্কদিগের অবস্থানুযায়ী কানাই নিজেকে অতি স্বাভাবিক ভাবেই গড়িয়া তুলিতে প্রযত্ন করিত।

ভবিষ্যতে তাই তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন দেখিতাম। কিছুর অভাব তাহার অনুভব হইত না। যাহা পাইত তাহা খাইয়াই কানাইয়ের মুখে হাসি ধরিত না। জামা কাপড়ে তাহার কোন আড়ম্বর ছিল না।

দরিদ্র মহারাষ্ট্র বালকগণের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কানাই বড় কাতর হইয়া পড়িত। মধ্যে মধ্যে মায়ের নিকট তাহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিত—ইহাদের মধ্যে একজন তাহার বিশেষ বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পুরা নাম আমাদের জানা নাই, কানাই তাহাকে "টোষা" বলিয়া উল্লেখ করিত। এই বালকের পিতা মাতা প্লেগে মারা যায়। এই নিরাশ্রয় বালকের উপর কানাইয়ের অগাধ স্নেহ দেখা যাইত। ইহাকে সে নিজের ভাইয়ের মত যত্ন করিত এবং নিজের বাড়ীতে প্রায় রাখিয়া দিত। দুঃস্থ ব্যথিত আশ্রয়হীনের উপর তাহার আন্তরিক করুণা কি মধুর সুরে ঝঙ্কার দিত, পরিণত বয়সেও আমরা তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাইয়াছি।

"টোষা" কানাইয়ের সহৃদয়তার কথা ভুলিতে পারে নাই, কানাইয়ের মৃত্যুর পর টোষা কানাইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এক পত্র দিয়াছিলেন।

কানাইয়ের প্রিয় খাদ্য ছিল মুড়ি আর দুগ্ধ। এই মুড়ি দুগ্ধ খাইয়াই কানাই জননীর নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করে। বাল্যকালে কানাই আড়াই সের করিয়া প্রতিদিন মহিষ দুগ্ধ পান করিত।

কানাই পড়াশুনা কম করিত। প্রতি বৎসর পরীক্ষার সময় কানাই পদচারণ করিতে করিতে পাঠ্যপুস্তকগুলি একবার উল্টাইয়া যাইত, কিন্তু তাহাতেই সে ক্লাসের মধ্যে প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। বি. এ. পাশ করার সময়ে এইরূপ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঠিক পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলি লইয়া সে কেবল পাতা উল্টাইয়া যাইত। আমরা নিশ্চয় ভাবিয়াছিলাম কানাই এবার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। কিন্তু যথাকালে, পাশের খবর পাইয়া বিস্মিত হইলাম এবং তাহার প্রতিভাকে ধন্যবাদ দিলাম।

কানাইয়ের বাল্যজীবনে দারিদ্র্যপ্রীতি, দরিদ্র বালকগণের সহিত অসাধারণ সৌহৃদ্য স্থাপনে অনুরাগ, পরোপকার প্রবৃত্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের সহিত একটি বিশেষ গুণ ছিল—সেটি সত্যনিষ্ঠা। কানাই বিনয়ী ছিল অসাধারণ, কখনও পিতামাতার মুখের উপর চক্ষু চাহিয়া সে কথা বলিত না। কিন্তু কোথাও সত্যের অপলাপ ঘটিলে, ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের মত সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত, মুখ দিয়া তার কখনও মিথ্যা কথা বাহির হইত না। একটি ঘটনায় তাহার সত্যপ্রীতি কেমন চমৎকার রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই বলিব।

একদিন কানাইয়ের মাতুল কানাইকে রৌদ্রে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কি আর করে, অগত্যা কানাই ছাদে উঠিবার টিনের ছাদের তলায় বসিয়া অন্যান্য বালকগণের ঘুড়ি উড়ান দেখিতেছিল।

নিম্নতল হইতে মাতুল ভাবিলেন, কানাই রৌদ্রে ঘুড়ি উড়াইতেছে,

এইজন্য কানাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কানাই ছাদ হইতে নিম্নে আসিবা-মাত্র মাতুল সক্রোধে কানাইয়ের পিঠে একটী চড় বসাইয়া দিলেন। কানাই সবিস্ময়ে এইরূপ প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ইহা ঔদ্ধত্য ভাবিয়া মামা কানাইয়ের পৃষ্ঠে আরও তুই চারি ঘা বসাইয়া দিলেন। কানাই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন আর কিছুতেই নিবারণ হয় না; কারও কথা শুনিল না, একপ্রকার "সত্যাগ্রহ" করিয়া বসিল। অনেক পীড়াপীড়িতে সে বলিল, সে অবাধ্য নহে, রৌদ্রে সে যায় নাই অথচ তাহার কথা বিশ্বাস করা হইতেছে না। ইহাই তাহার তুঃখ, তাহার কথা বিশ্বাস না হইলে সে কিছুতেই আহারাদি করিবে না। তখন অপরাপর বালকদের ডাকিয়া মাতুল জানিলেন, কানাই যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কথা। সে তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া রৌদ্রে ঘুড়ি উড়ায় নাই, মাতুল বড় অপ্রস্তুত হইলেন। সস্নেহে কানাইকে আদর করিয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিলেন। প্রফুল্লমুখে আহারে বসিল কানাই। এই ঘটনা হইতে কানাইয়ের অভিভাবকগণ বুঝিয়া নিলেন—কানাই মিথ্যা বলিয়া কখনও প্রবঞ্চনা করিবে না। তাই, কানাই যখন চাকুরী করিতে যাইব বলিয়া জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতায় গেল, বলিয়াছি কানাইয়ের মাতা সেদিন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কানাই চাকুরী করা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতায় যাইতেছে। এমন কি কানাই রাজদ্রোহ অভিযোগে ধৃত হওয়ার সংবাদ পাইয়াও তিনি কানাইকে এইজন্য অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। হায় মা! সুসন্তান কানাইকে যে জননী সেদিন সন্তান বলিয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন তিনি যে "দেশজননী"। তাই জননীর ক্ষুদ্র স্নেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

ফেনাইয়া ফেনাইয়া আর অধিক কথা বলিবার কিছু নাই। যাহা বলিলাম ইহাই কানাইয়ের জীবন-কথা। কানাইয়ের অন্তর্নিহিত স্পর্দ্ধার কথা। নির্ভয়ে বলিতে পারিয়াছি কিনা জানি না। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ

বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া আমি কানাইয়ের জীবনী লিখি নাই। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাহার স্মৃতিটুকু বলাই আমার উদ্দেশ্য। আর সে স্মৃতি যতখানি সত্য ও অবিকৃত হয় তাহার জন্য যথেষ্ট সতর্ক হইয়াই আমি কলম চালাইয়াছি—কানাই আজ কোন্ যোজন যোজনান্তরে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে আত্মা অমর, অন্তরাত্মার সঙ্কল্প, ভাব, অনিবার্য্যরূপে ভবিষ্যৎ জাতির স্কন্ধে আরোপিত হয়, তাই এই কথাটা বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, যদিও হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্য করিয়াই কানাই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, দেশের শ্রদ্ধা পাইয়াছে, তবু যতদূর জানি তাহাতে ইহা তাহার জীবনের একটা আকস্মিক ঘটনা ভিন্ন আর কিছু নহে। কানাইয়ের আসল কথা ছিল দেশপ্রীতি, দেশজননীর মুক্তি। রাগদ্বেষহীন সত্যনিষ্ঠ চরিত্রবলেই উহা সাধিত হইবে এই ছিল তার আশা। এই বিশ্বাস লইয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে আগাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জাতি এই অখণ্ড বিশ্বাসবলে সত্যব্রতী হইয়া জয়যুক্ত হউক ইহাই আমার প্রার্থনা।

॥ উপসংহার ॥

[এই উপসংহার বিপ্লবী নায়ক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত]

১৮৯৫ সালে আমরা যখন চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজের এন্‌ট্রেন্স ক্লাসে পড়িতাম তখন কানাইলালের বড় ভাই আশুতোষ আমাদের সহপাঠী ছিল। মাঝে মাঝে আশুতোষদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম, দেখিতাম ছোট একটী ছেলে তার আশেপাশে 'দাদা' 'দাদা' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তখন জানিতাম না যে, সেই আমাদের ভবিষ্যতের কানাইলাল। ঠিক মনে নাই, বোধহয় ১৮৯৬ সালে কানাইদের বাড়ীর সকলে করাচী চলিয়া যান। সেই অবধি প্রায় দশ বৎসর আর কানাইলালের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

১৯০৭ সালের শেষাশেষি কানাইলাল একবার কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করে। মানিকতলার বাগানের কথা সে জানিতে পারিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা যে বাগানে আসিয়া ভর্ত্তি হয়।

সেবার কানাইলালের চিত্র পরীক্ষা দিবার কথা। আমি বলিলাম—পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে আসিও। নূতন ছেলে আসিলে তাহাকে এইরূপ একটা অজুহাতে অনেক সময় ফিরাইয়া দিতাম। কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইত। যাহার নিতান্ত প্রাণের জ্বালা ধরিয়াছে সেই আবার ফিরিয়া আসিত।

বাঙ্গালীর জীবনে সে এক অপূর্ব্ব দিন। রুদ্র তখন বাঙ্গালীর ছেলেদের মাথায় ভর করিয়াছে; মরণ তখন হাতছানি দিয়া বাঙ্গালীর ছেলেকে গৃহহারা করিয়া দিয়াছে। তাই আমাদের কাছে তাড়া খাইয়াও অনেক ছেলে আবার ফিরিয়া আসিত। কানাইলালও চিত্র পরীক্ষা শেষ করিয়া আবার একটা বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিল।

তখন আমাদের চারিদিকে পুলিশ লাগিয়াছে। তাহার উপর কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে বারীন্দ্র যেরূপ অসাবধান তাহাতে শীঘ্রই যে একটা ফ্যাঁসাদ বাধিয়া উঠিবে, এ সন্দেহও আমার মনে দিন দিন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। পুলিশদের প্রথম চোটটা যে মানিকতলা বাগানের উপরেই পড়িবে তাহাও বুঝিতাম। সব ছেলে যদি বাগানে ধরা পড়ে তাহা হইলে হয়ত আমাদের দলটা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, এ ভয় আমার ছিল। কাজে কাজেই নূতন নূতন ছেলে দেখিলে তাহাদের বাগানে রাখিতে ইচ্ছা হইত না। তাই আমি কানাইলাল ও তাহার বন্ধুকে চন্দননগরে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম—আশা দিলাম যে, ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে ডাকিয়া আনিব।

বন্ধুটী ফিরিয়া গেল, কিন্তু কানাইলাল আর ফিরিল না। সে বারীনকে ধরিয়া বসিল যে, তাহাকে রাখিতে হইবে। বারীনও সম্মত হইল।

সে সময় কানাইলাল বোধহয় দুই চারিদিনের বেশী বাগানে থাকে

নাই। চাটগাঁয়ের একটা কারখানায় আমাদের একজন লোক রাখিবার দরকার হয়। কানাই সে কাজের জন্য চাটগাঁয় চলিয়া যায়। ঠিক হয় যে, কারখানার কুলীদের ভিতর কানাই মিশিয়া থাকিবে ও তাহাদের মত মজুরী খাটিয়া আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিবে। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে কুলি সাজা বড় শক্ত, তাহার উপর কানাইয়ের চোখে আবার চশমা। কাজে কাজেই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদের চাটগাঁ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কানাই যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার আড্ডা হইল গোপীমোহন দত্ত লেনে। বোমার কারখানায়। বাগানে বসিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করা তাহার ভাল লাগিত না—সে কাজ চায়।

*　　*　　*　　*

মে মাসের প্রথমে যখন ধরা পড়িয়া আলিপুর জেলে আসিলাম, তখন দেখিলাম ধৃতদের মধ্যে কানাইলালও একজন। মনে হইল, কানাই যেদিন প্রথম আমার কাছে আসে, সেদিন যদি তাহাকে জোর করিয়া চন্দননগরে পাঠাইয়া দিতাম তাহা হইলেই বোধহয় ভাল হইত। কিন্তু এখন আর ভাবিয়া ফল নাই। জেলে হট্টগোল করিয়াই দিন কাটিয়া যাইত। ছেলেদের মধ্যে একদল একটু আধটু ধর্ম্মচর্চ্চা করিত। মাঝে মাঝে নাক টিপিয়া প্রাণায়াম করিতে বসিত। গীতা উপনিষদের আলোচনাও করিত। কানাই সে দলে ছিল না। ধর্ম্মকর্ম্মের সে বড় একটা ধার ধারিত না। আত্মা পরমাত্মা লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিত না।

খেলাধূলা, লাফালাফি, বিস্কুট চুরি, সন্দেশ চুরি, আম লইয়া মাখামাখি করা—এই ছিল কানাইলালের জেলখানার কাজ। দিনের বেলায় সে তিন চার থালা লপ্‌সি খাইয়া পড়িয়া ঘুমাইত আর রাত্রে উঠিয়া একজনের কাছার সহিত অপরের কোঁচা বা অভাব পক্ষে এক আধটা বিড়াল ছানা বাঁধিয়া দিয়া যাইত। ধরা পড়িবার আগেই টুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া নাক ডাকাইত।

নরেন্দ্রনাথের কথা লইয়া যখন ছেলেদের মধ্যে খুব আলোচনা চলিত, কানাই সে আলোচনায় বড় বেশী যোগ দিত না। সে শুধু শুনিত আর মাঝে মাঝে আলোচনা হইত। কেহ বলিত সকলের ফাঁসী হইবে। কেহ বলিত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা হইবে। কানাই শুধু একদিন বলিয়াছিল যে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস করা তাহার পোষাইবে না।

* * * * *

ইহার পরেই একদিনই কানাইয়ের পেট হঠাৎ কামড়াইতে আরম্ভ করিল। পেটের যন্ত্রণা এত অধিক যে, তাহাকে ধরিয়া রাখাই দায়। ডাক্তার আসিয়া তাড়াতাড়ি হাঁসপাতালে লইয়া গেলেন। কম্বল জড়াইয়া বিছানা কাঁধে করিয়া কানাই হাঁসপাতালে চলিয়া গেল।

তারপর একদিন সুপ্রভাতে শুনা গেল কানাইলালের গুলীতে নরেন্দ্র গোঁসাই মারা পড়িয়াছে। কানাই ফাঁসীর কুঠরীতে বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ৪৪ ডিগ্রীতে আসিয়া পড়িলাম।

সে পুরাতন কাহিনী বর্ণনা করিবার আর প্রবৃত্তি নাই। আজ সব কথাই প্রায় মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। শুধু মনে আসে কানাইলালের মুখ আর সেই শান্ত অপরূপ শ্রী। আজ যখন চারিদিকে শুনিতে পাই যে, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, আজ যখন শুনিতে পাই যে সহিষ্ণুতাই স্বদেশ সেবার প্রধান অবলম্বন—তখন চুপ করিয়া তাহা শুনি বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কানাইলালের পরম শান্ত মুখচ্ছবি মনে পড়ে। এ কি হত্যাকারীর চোখ? একি অশান্ত চোখ? একি অধার্ম্মিক চোখ? অন্তরাত্মা সে কথায় সায় দেয় না, মন শুধুই বলে ধর্ম্মের তত্ত্ব হিংসা অহিংসার অতীত। ভগবানের হাতের যে যন্ত্র সে আমাদের পাপ পুণ্যের হিসাবের ধার ধারে না।

কানাই মরিয়াও মরে নাই, কেননা এ তত্ত্ব আজ তাহার কাছ হইতে দেশকে শিখিতে হইবে। যতদিন বাংলা থাকিবে, বাঙ্গালী থাকিবে ততদিন কানাইলাল অমর।

শেষ